পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

Choice of Ornaments
designs Superfine Finish
Enamelling Durable Settings and
genuine guinea gold are the main
istics of our Jewellery In all our manufac
everything needed for complete perfection is
and this is why you always get in your
ornaments exactly what you want
range of distinctive jewellery are always
for sale and are also made to order in a
short time Muffasil orders are executed by
V P P Old gold and silver can be exchanged
new ornaments Making charges moderate
M B SIRKAR & SONS
SON AND GRANDSONS OF LATE B SIRKAR
Manufacturing Jewellers
124, 124/1, BOWBAZAR ST. CALCUTTA. PHONE B B 761

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বেঙ্গল পাব্লিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বেঙ্গল পাব্লিশার্স-এর পক্ষে
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট,
কলিকাতা।

দেড় টাকা

মাঘ, ১৩৫০

প্রিণ্টার—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর।

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানেই প্রথম আমি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও গ্রন্থ-সম্পাদক রূপে শান্তিনিকেতনে যোগ দিই। তারপর ঠাকুর-পরিবারের গৃহশিক্ষকও হয়েছিলাম। স্বভাবতঃই কবিকে তাঁর প্রাত্যহিক পরিবেশের ভেতর খুব নিখুঁত করে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। এছাড়া যে জন্যেই হক, কবির আন্তরিক স্নেহদৃষ্টি পড়েছিল আমার ওপর, তাই তাঁর ব্যক্তি-জীবনের, তথা ভাব-জীবনের নানা দিক অত্যন্ত অনায়াসেই উদ্ঘাটিত হয়েছিল আমার সামনে। তখনি আমার মনে হয়, এই অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, দেশবাসীর হাতে পরিবেষণ করে দেওয়া উচিত। উল্লেখযোগ্য আলোচনা সমূহের নোট রাখতে সুরু করি—ফিরে এসে লেখায় হাত দিতে দিতে দেরী হয়ে গেল, ইতিমধ্যে আকস্মিক পীড়ায় কবির জীবনান্ত হল। তখন তাঁকে যেমন দেখেছি, যে-সব কথা শুনেছি তাঁর মুখে, তা শোনানোর তাগিদ আসতে লাগলো রবীন্দ্রানুরাগী বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে। 'যুগান্তর সাময়িকী'তে ধারাবাহিক ভাবে লেখা আরম্ভ করলাম—সেই লেখাই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে গ্রথিত হল এই বইয়ে।

নূতন সংযোজন যেটুকু কবেছি, সে শুধু পুনরুক্তি পরিহাবের জন্যে বা বচনায় পাবম্পর্য্য স্থাপনেব জন্যে। দু-একটা ছোটখাটো ভুল ছিল—তা-ও সংশোধন কবে দিয়েছি। এই বইয়ের বচনায় ও প্রকাশে যাঁদেব উৎসাহ ও সহযোগিতা সব চেয়ে বেশী মূল্যবান বলে গণ্য করি, যুগান্তরের ও বিশ্বভাবতীব সেই বন্ধুদের আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কবি-পুত্র বথীন্দ্রনাথ চিঠিতে এই বইটি সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ কবেছেন, তাঁকেও আমাব ধন্যবাদ।

জানুযাবী ৩০,
১৯৪৪

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

করবী ঘোষ
প্রীতিভাজনাসু

লেখকের অন্যান্য বই

কবিতা ঃ	সেতু	১।০
	ঝিলিমিলি	।৵০
গল্প ঃ	মিছে কথা	১৲
	ছন্দপতন	১৲
	হারাণ বাবুর ওভার কোট	৸০
রসরচনা ঃ	প্রেম ও পাদুকা	১।০
	সুইসাইড	১৲
নাটিকা ঃ	বনটিয়া	।।৵০
প্রবন্ধ ঃ	বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা	২৲
	শতাব্দী ও সাহিত্য	২৲
	সমাজ ও যৌনজীবন	১।০
	সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ	।।৵০
উপন্যাস ঃ	অদৃশ্য সঙ্কেত	১৲
	দু'নৌকায়	১।০
	কাঁটাতার	১।০
	ধোঁয়া	২৲
জীবন ঃ	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ	১।।০

আশৈশব রবীন্দ্রনাথের গল্প শুনেছি—সে সমস্ত গল্প যে নিতান্তই গল্প, তা বুঝতে পারি অনেক দেরীতে। যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হল, শুধু পরিচয় নয়, দিনের পর দিন তাঁর সস্নেহ সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ হল, তখনি যাচিয়ে দেখলাম—দেখলাম, যা শুনেছি এতদিন পর্য্যন্ত, তার কিছুই সত্যি নয়। বুঝি অবশ্য, এ সমস্ত গল্প গড়ে ওঠার মূল কোথায়। মহৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে শ্রদ্ধাশীলতা, সেটা আগাগোড়াই সানুরাগ আত্মসমর্পণ নয়, তার পেছনে প্রায়ই থাকে আত্মাবলোপ জনিত ক্ষোভের একটি প্রতিক্রিয়া—এই প্রতিক্রিয়াই অভিব্যক্তি লাভ করে নানা রটনায়, নয়ত আতিশয্যমণ্ডিত গাল-গল্পে।

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

সরলভাবেই বলছি, কি-কি গুজব শুনতাম কবির সম্বন্ধে। প্রথমতঃ শুনতাম—তিনি সর্ব্বদা এমন ভাবেই সেক্রেটারী ও পার্শ্বচরবৃন্দে পরিবৃত হয়ে থাকতেন, যে তাঁর ত্রিসীমানায় কোন দীন-দুঃখী ত দূরস্থান, সাধারণ ভদ্রলোকেরও ঘেঁষার জো ছিল না। তারপর শুনতাম, আহার-পরিচ্ছদ, আরাম-আয়েসে তাঁর ধরণ ধারণ ছিল মোগল বাদসাদের মতো। চীন থেকে, পারস্য থেকে, ফ্রান্স থেকে, ইটালী থেকে নাকি আসতো এজন্যে নিত্য নূতন উপকরণ। তারপর শুনতাম, তিনি দেশের ও দেশবাসীর সুখ-দুঃখের কোন খবরই রাখতেন না—তাঁর যা-কিছু যোগাযোগ ছিল বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে। দেশের কথা তাঁর কাছে তুলতে গেলেই নাকি বিরক্তি প্রকাশ করতেন—এমন কি, খবরের কাগজগুলো পর্য্যন্ত নাকি তাঁর টেবিলে স্থান পেতো না।

এই সমস্ত গল্প যাঁরা বলতেন, সমাজ-জীবনে তাঁদের অনেকেরই প্রতিষ্ঠা ছিল এবং কেউ কেউ কবির সংস্রবেও এসেছিলেন কোন-না-কোন সময়। সুতরাং বিশ্বাস করতাম। কিন্তু লেখার ভেতর দিয়ে শৈশবেই যিনি হৃদয় জয় করেছিলেন, জীবনে তিনি ছিলেন এমন বাস্তব-বিমুখ, এতখানি হৃদয়হীন, এ কথা ভাবতেই দুঃখ হত।

সত্যি কথা বলতে কি, এজন্যে সময় সময় মনে হত, রবীন্দ্র-সাহিত্যের বাণীতে আন্তরিকতা নেই—ও একটা তৈরি করা জিনিষ। জনপ্রিয়তা বজায় রাখবার কৌশল মাত্র।

তাই গোড়া থেকেই ছিল অদম্য একটা কৌতূহল কবির কাছাকাছি যাওয়ার, সাম্নাসাম্নি তাঁকে দেখার। জুটেও গেল সে সুযোগ। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, যা শুনেছি এতদিন, তাতে সত্যের বাষ্পও নেই। সেক্রেটারী তাঁর একজন ছিলেন ঠিকই এবং অনুরাগী পারিষদও ছিলেন দু-চার জন—কিন্তু তাঁর বরাবর হাজির হওয়ার পথে খবর্দ্দারী করার হুকুম ছিল না তাঁদের কারুরই ওপর। বরং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে স্যার মরিস গায়ার বা স্যার জেমস জীনস থেকে সুরু করে, বীরভূমের দরিদ্র বাউল পর্য্যন্ত, সকলের জন্যেই ছিল তাঁর সৌজন্যের সিংহ-দুয়ার সমানভাবে খোলা এবং কারুর জন্যেই কোন-রকম ব্যবহার-ভেদের ব্যবস্থা ছিল না। যে বাউলের কথা বলছিলাম—মোড়ায় বসে একতারা বাজিয়ে গান শোনাচ্ছে সে, আর সাম্নে বসে কবি তাই শুনছেন—এ কত দিন দেখেছি। গীতান্তে তাকে চা-পান এবং জলযোগ করাতেও ভুল হত না তাঁর।

এই একটা লোক বলে নয়—স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা, গাঁয়ের সাধারণ চাষী-মজুররা, নানা দিক-দেশের কৌতূহলী দর্শকেরা, যখন যে তাঁর দর্শন-প্রার্থী হয়েছে, তখনি পেয়েছে তার সুযোগ। শুধু দর্শন নয়, রীতিমতো ভাবে আসর জমিয়ে বসে গল্প করেছে—জোর করে অটোগ্রাফ আদায় করেছে, ছবি নিয়েছে। কোন দিন বিন্দুমাত্র বিরক্তি দেখিনি তাঁর। বিরক্তি হত বরং আশে-পাশে যাঁরা থাকতেন তাঁদের—সময় সময় অনুযোগও করতেন তাঁরা। একদিন এই অনুযোগের উত্তরে বলতে শুনলাম কবিকে, 'তোমরা ওদের পথ রোধ করো না—ওরা আমার কাছে আসে, আমার অন্তরকে ওরা ছুঁতে পারে।' তথাকথিত অবাঞ্ছিতেরা যে তাঁর অন্তরকে ছুঁতে পারে, এ আমার কাছে প্রথমটা মনে হয়েছিল একটা আবিষ্কৃতির মতো। বাল্য-বিশ্বাসের এক ধাপ ভেঙে পড়লো এইখানে। এর পর বলি তাঁর আরাম-আয়েসের কথা।

বীরভূমের প্রচণ্ড শীতেও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিছানা ছেড়ে উঠতেন তিনি এবং শ্যামলীর বারান্দায় টেবিল বিছিয়ে বসে যেতেন—বেলা দশটা পর্য্যন্ত একটানা চলতো লেখা-পড়া, চিঠি-পত্র দেখা, তার জবাব দেওয়া, অতিথি-

অভ্যাগতের সঙ্গে দেখা করা—তারপর স্নান ও আহার—তারপর ? দিবানিদ্রা নয়, এমন কি একটু গড়াগড়ি দিয়ে নেওয়া পর্য্যন্ত নয়—খাড়া একটা কেঠো চেয়ারে বসে, হয় লেখা, নয় ছবি আঁকা। তারপর বিকেল—বৈকালিক জলযোগ—আবার অতিথি-অভ্যাগত, সেই সঙ্গেই অল্পস্বল্প লেখা-পড়া। এর পরে সন্ধ্যা—উত্তরায়ণে গান-বাজনার মহড়া থাকলে তাতে যোগ দেওয়া, নচেৎ আপন ঘরে বসে পড়াশুনা। ন'টা সাড়ে ন'টায় নৈশ ভোজন এবং সেখানেই সে-দিনের মতো যবনিকা পতন। ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো সুনিয়ন্ত্রিত জীবন এবং সে জীবন কঠোর শ্রমে অনলস আত্মনিগ্নতায় মহনীয়। কোথায় অবসর ছিল তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-আয়াসের প্রতি দৃকপাত করবার ?

যেটুকু আলস্য, যেটুকু অবসর যাপন অতি সাধারণ স্তরের লোকও করে থাকেন, তিনি তা-ও করতেন না। এ সম্বন্ধে কথা তোলায় একদিন বললেন, 'তোমরা অনেক দিন বাঁচবে—ধীরে-সুস্থে কাজ করতে পারো। আমার ত আর সময় নেই, তাই তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছি সব।'

যাঁরা বলতেন, কবিকে প্রতিদিন একটি ভৃত্য কমলানেবুর খোসা আর মটর ডাল বেটে গায়ে মাখায়,

আর একটি ভৃত্য আতর মাখানো চিরুণী দিয়ে তাঁর চুল ও দাড়ি আঁচড়ে দেয়, আর একটি শিক্ষিত নার্স তাঁকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাসাজ করিয়ে দেয়—কোথা থেকে তাঁরা পেতেন সে-সব তথ্য? যে পঁচাত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধকে দেখতাম প্রতিদিন একটি যুবকের চেয়ে দশগুণ বেশী পরিশ্রম করতে এবং কোথাও তাঁর ক্লান্তি বা বিরক্তি আছে মনেই হত না, তাঁর যে কস্মিনকালেও এই ধরণের খেলো বড়মানুষী থাকতে পারে না, এটা বোঝার বাধা হয় নি কোন দিনই।

এই সব রটনার আসল কারণটা আন্দাজ করতে পারি। কবির দৈহিক গঠন ও গায়ের রং স্বভাবতঃই ছিল অ-বাঙালী সুলভ—কমলানেবুর মতো এমন দ্যুতিমান রং এবং এত বড় লম্বা-চওড়া চেহারা আমরা আর কার দেখেছি? এর উপর তুষারশুভ্র চুল ও দাড়িতে তাঁকে সত্যিই দেখাতো অলোকসামান্য সুন্দর। কাজেই মনে হত, বুঝি সযত্ন পরিমার্জ্জনায় আর পরিপাটি পরিচ্ছদে এই রূপটা তিনি নিজে হাতে গড়ে তুলেছেন! কিন্তু মোটেই তা নয়—সবটাই তাঁর স্বভাব-সম্পদ।

পরিচ্ছদ আর আহারের কথাটাও বলে নিই। বহুদিন সামনে বসে থেকেছি তাঁর আহারের সময়, কোন

কোন দিন সঙ্গও নিয়েছি। কৈ চীন-জাপান বা ইরাণ থেকে আহৃত উপকরণ ত থরে থরে খাওয়ার টেবিলে সজ্জিত হত না—নিতান্তই সাধারণ ভোজ্য সব জিনিষ—বরং সাধারণের পাতে ওঠে না এমন অনেক জিনিষও, যথা কচু-সিদ্ধ, কিংবা নিমপাতা বাটা! আর পোষাক? হ্যাঁ, পোষাকটা তাঁর সর্ব্বসাধারণ থেকে আকারে পৃথক ছিল একটু—কিন্তু সে পার্থক্য তাঁর পারিবারিক প্রসিদ্ধির অনুসরণ—নইলে উপকরণে তাঁর প্রাত্যহিক পোষাক মোটেই মহামূল্য ছিল না। সাধারণ টুইল, লংক্লথ, কেটো, মটকা, খদ্দর—এই তিনি পরতেন। বেশীর ভাগই পরতেন খদ্দর এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও। সুতরাং এ-ও আগাগোড়া একটা গুজব।

দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে তাঁর যে ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা ছিল না, একথা নূতন করে প্রমাণ করতে যাওয়াই হবে আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কারণ তার পরিচয় ত শুধু শান্তিনিকেতনের চতুঃসীমায় আবদ্ধ ছিল না—সমস্ত দেশই পেয়েছে সে পরিচয় পুনঃ পুনঃ। আমি শুধু একটা মাত্র ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করছি। একদিন দুপুরে কবি সংবাদপত্র পড়ছেন—বড় বড় অক্ষরে একটি জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার সংবাদ বেরিয়েছে—অন্নহীন নর-নারীর সে

কি মর্ম্মান্তিক দুঃখ-দুর্দ্দশার বিবরণ! কবি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'দুর্ভিক্ষ অন্য দেশে হয় না—তারা ভিক্ষা করতে বেরোয় না যে—তারা জানে, কি করে আদায় করে নিতে হয়!' এই একটা কথাই কি দেশ ও দেশবাসী সম্বন্ধে প্রতিদিনকার জীবনে তাঁর কি মনোভাব ছিল, তা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

আমার এতক্ষণের আলোচনা থেকে হয়ত আপনাদের ধারণা হয়েছে যে প্রাত্যহিক জীবনে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্ব-সাধারণেরই একজন ছিলেন —আর ঈর্ষাপরায়ণ অসুস্থচিত্ত ব্যক্তিরা তাঁর নামে নানা মিথ্যা গুজব ইতস্ততঃ রটিয়ে বেড়াতেন। বলা বাহুল্য, মোটেই তা নয় এবং আমিও সে কথা বলিনি। আহারে-পরিচ্ছদে, চালে-চলনে, সামাজিক আদান-প্রদানে, কোথাও তাঁর তথাকথিত বড়-লোকী ছিল না, কোথাও কাপট্য, কৃত্রিমতা বা আতিশয্য ছিল না—এই পর্য্যন্ত। নইলে সর্ব্ববিষয়েই তাঁর অসাধারণত্ব ছিল বৈকি। অসাধারণ মানুষ—থাকবে না কেন?

যে-কোন লোককে যে-কোন সময় তিনি তাঁর খাস কামরায় প্রবেশাধিকার দিতেন এবং তার সঙ্গে অমায়িক হৃদ্যতায় কথাও কইতেন। কিন্তু সে কথার মধ্যেই থাকতো

তফাৎ—কি রকম তফাৎ এর পরে তা দেখাতে চেষ্টা করবো। আহার এবং আচ্ছাদনে তাঁর আড়ম্বর বা আবিলতা ছিল না, কিন্তু শৃঙ্খলা, শালীনতা ও সুরুচিতে তা অদ্বিতীয় ছিল নিশ্চয়। পরিশ্রম তিনি করতেন—কঠোর পরিশ্রমই, কিন্তু সে পরিশ্রমও এমনই আত্মস্বতন্ত্র প্রকৃতির যে তার সঙ্গে যে-কোন লোকই আপনার যোগ-সূত্র খুঁজে পেতো না। এ সবই অসাধারণতা এবং এই ত তাঁর কাছে প্রত্যাশিত!)

এর ওপরেও ছিল আর একটা জিনিষ—সে তাঁর ব্যক্তিত্বের গভীরতা। তাঁর অন্তর্গূঢ় ভাব-সত্তা অভিব্যক্ত হত তাঁর কথায়, কাজে, চলনে-বলনে—সচরাচর যে দৃষ্টি দিয়ে আমরা বস্তু-সংসারের বিচার করি, সেই দৃষ্টিতে এই অভিব্যক্তিটা ঠেকতো কেমন যেন বিচ্ছিন্ন গোছের, মনে হত যেন কৃত্রিম, যেন সমস্ত জৈব ও জাগতিক ব্যাপারের ওপর দিয়ে তিনি হাল্কা পায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছেন। কিন্তু এ হল তাঁর সদা-জাগ্রত ভেতরকার শিল্পী-সত্তার প্রকাশ—যে প্রকাশকে আমরা পারতাম না সব সময় সহজ বুদ্ধিতে ধারণা করে নিতে। যা-কিছু গাল-গল্প, যা-কিছু উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর সম্বন্ধে, সে শুধু তাঁর এই ভেতরকার অন্যতর সত্তাটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই।

কিন্তু খুব কাছাকাছি যাঁরা গেছেন তাঁর এবং এই লোকোত্তর কবি-সত্তার অন্তর্লগ্ন মানুষটিও যাঁদের কাছে ধরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, মানুষ রবীন্দ্রনাথও সত্যিকার মানুষ ছিলেন—সহজ মানুষ, মিষ্টি মানুষ, অমায়িক মানুষ। (অবশ্য সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথে ও বাস্তবের রবীন্দ্রনাথে এ-দিকে কোন বিরোধিতা ছিল না—যা অনেক বড় প্রতিভাধরের থাকে।) সেই কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া জীবন সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা আমি আপনাদের শোনাতে চেষ্টা করবো। এ অধ্যায়ে শুধু তারি গৌরচন্দ্রিকা করে রাখলাম।

— ২ —

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে জায়গাটায় থাকতেন তার নাম উত্তরায়ণ—রবির উদয়-পথ, সেই জন্যেই বোধ হয় এই নাম। উত্তরায়ণ একটা বাড়ী নয়—একটা কম্পাউণ্ড—ওর ভেতর ছোট-বড় অনেকগুলো বাড়ী আছে। সবচেয়ে বড় বাড়ীটির নাম হল উদয়ন—ওতে থাকেন কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পত্নী প্রতিমা দেবী। উদয়নের পেছন দিককার বাগান ধরে কয়েক রশি গেলেই পড়ে মালঞ্চ—এটা কবির কন্যা মীরা দেবীর বাড়ী। অধুনা তাঁর কন্যা নন্দিতা ও জামাতা কৃষ্ণ কৃপালনীর বাসভবন। এছাড়া আছে আরো কয়েকটি বাড়ী, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হল শ্যামলী ও পুনশ্চ।

শ্যামলী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। আগাগোড়া মাটি দিয়ে তৈরী একটি অভিনব ধরণের ঘর—শুনেছি এর পরিকল্পনা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ কর। গোবরে নিকানো পরিচ্ছন্ন মেঝে ও রোয়াক—দেওয়ালে ইতস্ততঃ উৎকীর্ণ দু-একটি মৃন্ময় মূর্ত্তি—পেছনে এক ফালি বাগান, তারপরই দিগন্ত প্রসারিত বন্ধুর গেরুয়া খোয়াই ও তার মাঝে মাঝে দু-একটা তালগাছ ছবির মতো সুন্দর একটি নীড়। সামনের দিকটা এর উন্মুক্ত উত্তরায়ণের

দীর্ঘ উঠানের অভিমুখে—তারি মাঝখানে মস্ত একটা শিমুল গাছ—শীতান্তে রাঙা ফুলে ভরে উঠতো—আর গা ঘেঁষে উঠেছিল একটা বাঁকা-চোরা কাঠমল্লিকার গাছ, এরো ফুল ফুটতো অজস্র।

প্রতিদিন সকালে কবির টেবিল পড়তো এই সদর বারান্দায়—একটু বেলা বাড়লে, যেতেন পেছনের বাগানে। বহু বিখ্যাত রচনা তাঁর জন্মেছে এই শ্যামলীতে। শ্যামলীর পর তৈরী হয়েছিল পুনশ্চ—মার্কিণ মডেলের ছোট্ট বাড়ী, কাঁচের দরজা-জানলা—এরো পেছন দিকটা অবারিত, উন্মুক্ত, একেবারে গিয়ে মিশেছে রেল-লাইনের সীমানায়। কবি এটায় বেশীদিন বাস করেন নি—আমি দেখেছি এনড্রুজকে বরং তাঁর চেয়ে বেশীদিন এতে থাকতে। আর সুধীর কর ও আমি এর একাংশে দপ্তর নিয়ে বসতাম কিছু দিন।

এই দুটো ছাড়া ছিল আরো দুটো ছোট বাড়ী, কোন-না-কোন সময় কবি বাস করেছেন সেগুলোতেও। এর মধ্যে একটি হচ্ছে কোনার্ক, যা পরবর্ত্তী আমলে পরিণত হয়েছিল কবির ঘরোয়া লাইব্রেরীতে এবং যার পেছন দিকে থাকতেন কবির সেক্রেটারী অনিলকুমার ও তাঁর পত্নী। উদয়নের সংলগ্ন বাগানের কোণায় নহবৎখানার

মতো উঁচু করে বানানো আরো একটা বাচ্ছা বাড়ী ছিল —নাম কি মনে নেই—এতেও একবার মাসকয়েক থাকতে দেখেছি কবিকে, যে সময় তিনি 'প্রান্তিক' কাব্যটি লিখছিলেন। আমি চলে আসার পর পুনশ্চের বরাবর আরো একটা বাড়ী তৈরী করানো হয়েছিল, কিন্তু আমার স্মৃতির সঙ্গে তার কোন যোগ নেই বলেই তার কথা এখানে বলবো না।

মোটের ওপর শান্তিনিকেতনে কবির সংসার ছিল এই ক'টি বাড়ী, আর এই বাড়ী গুলির বাসিন্দাদের নিয়ে। তাঁর খাওয়া, থাকা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তদারক করতেন পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী। তিনিই ছিলেন কবি-সংসারের গৃহকর্ত্রী। এ ছাড়া দৌহিত্রী নন্দিতা দেবী, পৌত্রী নন্দিনী দেবী এবং শ্যালক-কন্যা সুনন্দা দেবীকেও দেখেছি কবির প্রাত্যহিক সেবা ও পরিচর্য্যার বিভিন্ন ভার বহন করতে। কবির বৈষয়িক কাজ-কর্ম্মের দায়িত্ব ছিল বেশীর ভাগ রথীন্দ্রনাথের হাতে—এ ছাড়া কৃপালনী এবং অনিল কুমারও এদিককার অনেকটা ভার বইতেন।

পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনী, নাত-জামাই ইত্যাদি নিয়ে গড়া কবির ঘরোয়া জীবন বেশ শান্তির ছিল, এটা মস্ত সান্ত্বনা। রবীন্দ্রনাথ যে-রকম ভাবুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাতে

এটা তাঁর কাছে যে খুব প্রত্যাশিত ছিল তা নয়। কিন্তু এদিকে তাঁর কোন ঔদাসীন্য বা বৈলক্ষণ্যই চোখে পড়তো না। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নয়—যখন-তখন তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন—কবি বিষম উদ্বিগ্ন হতেন ওঁদের স্বাস্থ্যহীনতার দরুণ। মনে আছে একবার রথীন্দ্রনাথের অসুখের খবর শুনে বলেছিলেন,'ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি, কে জানে এটুকুও ধ্বসে পড়ছে কিনা'। স্নেহশীল পিতার অন্তর চেনাতে এই একটা কথাই বোধ হয় যথেষ্ট। আর একবার দেখেছিলাম তাঁর স্নেহ-বিহ্বল চিত্তের প্রকাশ—তাঁর একমাত্র কন্যার একমাত্র পুত্র নীতুর মৃত্যু-সংবাদ এলো—কবি লিখছিলেন—লেখা থেকে মুখ তুলে বললেন, 'বেশী দিন বাঁচা কিছু নয়। সময়-লঙ্ঘনের দণ্ড পেতে হবে বৈকি।' মাত্র এইটুকু, কিন্তু এর চেয়ে বেশী আর কি বলতে পারতেন তিনি?

তাঁর স্নেহ-সুকুমার অন্তরের অভিব্যক্তি দেখেছি তাঁর দৌহিত্রী এবং পৌত্রীদের সঙ্গে ব্যবহারে। নন্দিতা দেবীকে তিনি কত রকম ঠাট্টাই করতেন। এদেশে নাতনী-দাদামশায়ে কৃত্রিম দাম্পত্য-সম্পর্ক পাতিয়ে হাসি-ঠাট্টার রেওয়াজ আছে। জিনিষটা মধুর হয়ত—কিন্তু কেন জানি না, আমার রুচিতে বাধে। নাতনী বা

নাত-বৌদের নিয়ে কবি হাস্য-পরিহাসের আমেজে রসায়িত করে তুলতেন সমস্ত আবহাওয়া, অথচ এই সনাতন বাঙালীপনা দেখিনি কোনদিন তাঁর ব্যবহারে। নন্দিনী একটু ভালোমানুষ গোছের ছিলেন---বয়সের সঙ্গে সমতা রেখে বুদ্ধির স্ফুরণ হয় নি তাঁর তখনো—কবি তাঁকে খ্যাপাতেন ছোট্ট মেয়েটির মতো করেই এবং তাঁর কৌতুক বুদ্ধির জন্যে মজার মজার গল্প বলতেন। সময় সময় ভয় দেখাতেন, আবার এক এক সময় আশ্চর্য্য করে দিতেন এক-একটা ইচ্ছাকৃত ছেলেমানুষীর অবতারণা করে।

মুখে মুখে নন্দিতা দেবীকে তিনি ছড়ায় আহ্বান করতেন। অনেকেই সম্ভবত টুকে রেখেছেন তার দু-পাঁচটা—আমার বাইরে কিছু নেই। নন্দিনীকে গল্প বলে খুসী করেছিলেন তিনি 'সে' বইয়ে। এই বইয়ের পুপেই হলেন নন্দিনী—পুপে তাঁর কবি-প্রদত্ত ডাকনাম। আর সবাই বলতেন পুষু—আমিও বলতাম পুষু। কবি জীবিত থাকতে থাকতেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়—কবিই সম্প্রদান করেছিলেন।

প্রতিমা দেবীকে তিনি মা ও বৌমা দু-রকমই বলতেন। অদ্ভুত একটি শিশুসুলভ নির্ভরতা দেখেছি তাঁর এই মহিলাটির ওপর। একজন বিদেশী সংবাদিককে

বলেছিলেন, 'I lost my mother very early and my wife died when I was still youthful—in her I have at last found a real mother for my late years.' কি অপূর্ব্ব স্নেহপ্রবণতার কথা! একান্ত আত্মীয় এই ক'জনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে যা প্রত্যাশিত—সেবা, শ্রদ্ধা, মমতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সবই তিনি পেয়েছেন প্রচুর পরিমাণে। নিজে দিয়েছেন বলেই পেয়েছেন অবশ্য। বার্দ্ধক্যে যখন দেহ অপটু হয়ে পড়ে, মন যখন হারায় তার গতিশীলতা, তখন স্বভাবতই প্রবহমান সমাজ-জীবন ও তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-বন্ধন শিথিল হয়ে আসে—তখন সকলের মধ্যে থেকেই মানুষ কেমন যেন নিজের একান্তে নির্ব্বাসিত হয়ে পড়ে। বার্দ্ধক্য সেই জন্যেই বড় দুঃখের সময়—এবং অন্তর-নিরুদ্ধ এই একান্ত আত্মকেন্দ্রিক দুঃখের কোন দোসর নেই দুনিয়ায়।

সৌভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের বয়স হয়েছিল—কিন্তু মন বুড়িয়ে যায় নি, মনের সজীবতা তিনি প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট রাখতে পেরেছিলেন। চতুষ্পার্শ্বের গাছ-পালা, ফল-ফুল, জীব-জন্তু, লোক-জন, কাজ-কারবার, আমোদ-উৎসব সব-কিছুর সঙ্গেই নাড়ীর বন্ধন তাঁর

বরাবর অব্যাহত ছিল। জীবনের কোন কিছু সম্বন্ধেই উৎসাহ তাঁর কমেনি, কোন বিষয়েই চিত্ত তাঁর বিরূপ হয়ে ওঠেনি—তাঁর নিজের কথাতেই, 'বার্দ্ধক্য যেন ওপর থেকে শুভ্র একটি মোড়কের আবরণ দিয়ে ভেতরের তাজা মনটাকে অবিকৃত রেখেছিল'। তাই দেখেছি বর্ষা নামলে, উঠানের শিমুল গাছটিতে ফুল ফুটলে, তাঁর আনন্দের সীমা থাকতো না। একদিন পোষা সারস একটা খাঁচা থেকে বেরিয়ে উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে ছুটো-ছুটি করছে—তার দিকে আঙুল দেখিয়ে কবি বলে উঠলেন, 'সারস, সারস।' শিশুর মতো প্রাণবন্ত উল্লাস।

মনটা এই রকম সরস রাখতে পেরেছিলেন বলেই বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর যোগ-সূত্র কোনদিন শ্লথ হয়নি—যাঁর সঙ্গে যে সম্বন্ধ তাঁকে সেই পথ্য দিয়েই তিনি তাঁর অন্তরে বেঁধে রাখতে পেরেছিলেন। আর এটা পেরেছিলেন বলেই বয়সের নদীতে প্রায় ও-পারের কাছাকাছি পৌঁছেও, তিনি এ-পারের, নয়ত মাঝ-নদীর লোকদের সঙ্গে সহজেই হাত মিলাতে পেরেছিলেন। এত সহজে যে অবাক লাগতো সময় সময়।

একদিন একটি বাচ্চা মেয়েকে গল্প বলছিলেন। যেমন তেমন গল্প নয়—'বাঘেরা যখন পান খেতো, সেই

অতিশয় শান্তির দিনে'র গল্প। শ্রোতাটির পক্ষে যা স্বাভাবিক—সে জিজ্ঞাসা করলো, 'পান খেতো? সেজে দিত কে?' উত্তর হল, 'সেজে দেবার ভাবনা কি? মণিকা, ঝর্ণা, শান্তা, কত মেয়েই যে ছিল বাঘের গুহায়!' 'কি সর্ব্বনাশ! খেয়ে ফেলতো না বাঘ?' উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি, 'খাবে কেন? একে মহানুভব বাঘ—তার ওপর পান সেজে দিত যে!'

ভৃত্য বনমালীর সঙ্গে রহস্যালাপেও দেখেছি ঠিক এই রকম নমনীয় আন্তরিকতা। একদিনের কথা বলি। কি একটা ত্রুটি করেছে সে। কবি বিরক্ত হয়েছেন—বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'জানিস, তোর আচরণ যদি সংবাদপত্রের সম্পাদকদের জানাই, তাহলে দেশ জুড়ে এক্ষুণি তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বইবে, বড় বড় 'স্তম্ভ' লেখা হবে—চাই কি একটা অনাস্থা প্রস্তাবও গৃহীত হতে পারে?' বনমালীর পক্ষে বক্তব্যটা বোঝা সহজ ছিল না, কিন্তু এটা সে বুঝলো যে কর্ত্তাবাবা আর যাই করুন রাগ করেন নি। বুড়ো মানুষের বিরক্তির এ রকম প্রকাশ আর কোথাও দেখেছি মনে পড়ে না।

কৃত্রিম সহৃদয়তার ফাঁদ পেতে অনুরাগ কুড়ানোর জন্যে অনেককে ভালো-মানুষ সাজতে দেখেছি। সেই

চেষ্টাকৃত সৌজন্যের অন্তরাল থেকে আসল মানুষটাকে চিনতে কিন্তু কোন দিনই বাধা হয় না! রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বেশ করে বাজিয়ে দেখেছি, এ-ই ছিল তাঁর মনোধর্ম্ম—তাঁর স্বভাব। সেই জন্যেই ত তিনি মানুষ হিসাবেও ছিলেন এতখানি আদৃত।

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

— ৩ —

বার্দ্ধক্যে মানুষ স্বভাবতঃই পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে —শরীরের অপটুতাই তার প্রধান কারণ। কিন্তু পরকে সহ্য করার মতো মনের স্বাচ্ছন্দ্য বুড়ো মানুষের থাকে না— তাই যার ওপর নির্ভর করতে হয়, সেবার জন্যে, সহায়তার জন্যে, তারি ওপর বুড়ো মানুষকে নির্ব্বিচারে বিষ-উদ্গার করতে দেখা যায় হামেশাই। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখেছি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে—প্রথমতঃ তিনি খুব কম ব্যাপারেই ছিলেন পরমুখাপেক্ষী, (অবশ্য পঁচাত্তর বৎসরেও অটুট কর্ম্মক্ষম স্বাস্থ্য এজন্যে অনেকটা দায়ী)—দ্বিতীয়তঃ পরকে সহ্য করে নেবারও অসামান্য দক্ষতা ছিল তাঁর—মনের স্বাস্থ্য বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকাই এর কারণ। প্রথমে তাঁর আত্মনির্ভরশীল অভ্যাসের দু-একটা গল্প বলি। একদিন দুপুরের দিকে কবি লিখছেন, ইতিমধ্যে ঝড় উঠলো—দুমদাম করে ঘরের জানালাগুলো খুলতে আর বন্ধ হতে লাগলো—ভৃত্য বনমালী কখন ফুরসৎ বুঝে ঘুমিয়ে পড়েছে—এই হৈ-হট্টগোলেও তার ঘুম ভাঙলো না। কবি তাকে জাগাতে বললেন না—লেখা ছেড়ে স্বয়ং উঠলেন এবং একটি একটি করে সব জানলা বন্ধ করে দিলেন। ভাবলাম, বনমালী নির্ঘাৎ ধমক খাবে—কিন্তু

না। স্বস্থানে ফিরে কবি স্মিত হাস্যে বললেন, 'ঘুমিয়েছে বেচারা! হঠাৎ জাগালে ধড়মড় করে উঠে শেষটা একটা কিছু অনর্থ করে বসবে! এসব টুকিটাকি কাজ গৃহস্থ লোককে করে নিতে হয় বৈকি।' এই 'গৃহস্থ লোক' কথাটা ঠাট্টার, আর বাকী কথাটা স্নেহের—কিন্তু সব শুদ্ধ জড়িয়ে কথাটা আত্মনির্ভরতার।

তার একদিন—সে দিন ৭ই পৌষের উৎসব। সবাই ব্যস্ত আমোদ-প্রমোদে—কেউ শালবনে, কেউ মেলায়। কবির হঠাৎ দরকার হল, একটা জরুরি জিনিষ ড্রাফ্‌ট করানোর—একটু অপেক্ষা করলেন এর-ওর আসার জন্যে। শেষটা নিজেই বসে গেলেন কলম নিয়ে এবং দীর্ঘ একটি ড্রাফ্‌ট, যা আসলে অন্যের করণীয়, নিজে তাই লিখে শেষ করলেন। সেক্রেটারী এসে পড়লেন তার পরেই—তারপর তাঁর অফিস থেকে টাইপ করানো হল।

এই দুটো ঘটনার মতো আরো বহু ঘটনা ঘটেছে আমার চোখের ওপর। অন্য যে কোন বৃদ্ধ হলে, এর প্রথমটিতে রেগে আগুন হয়ে যেতেন এবং দ্বিতীয়টিতে সহকারীদের সাহায্য না পেলে কাজই হতনা শেষ পর্য্যন্ত। বৃদ্ধ কেন, অনেক প্রতিষ্ঠাবান যুবককেও দেখেছি অতিশয় অসহায়ভাবে পরনির্ভরশীল হতে—তাঁরা জানলা বন্ধ করে

দেওয়া, গামছা এগিয়ে দেওয়া, আলো জ্বেলে দেওয়া—কোন কাজই নিজে করে নিতে পারেন না। একজন না একজন লাগাড়ো তাঁদের কাছে থাকা চাই-ই, ছোটবড় যাবতীয় ফাই-ফরমাস খাটাবার জন্যে। এটা হয়ত তাঁদের অক্ষমতা, হয়ত বা বড়লোকী—কিন্তু কি ভীষণ হাস্যকর!

রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি নিজেই পেন্সিল কেটে নিচ্ছেন, দেরাজ থেকে নিজেই জামা-কাপড় বের করে নিচ্ছেন, লেখার সরঞ্জাম হাতের কাছে এগিয়ে নিচ্ছেন। এমন কি, পা দিয়ে বসবার জায়গার জঞ্জাল সরিয়ে দিতেও দেখেছি। ওঁর মতো মানুষের এই সব ছোট কাজ সম্বন্ধে একটা অক্ষমতা বা ঔদাসীন্য থাকাই স্বাভাবিক ছিল—কিন্তু সানন্দে দেখেছি, এ সবের সঙ্গে তিনি কোন অমর্য্যাদার যোগ খুঁজে পেতেন না। অনেকবার মনে হয়েছে আমার—আমাদের দেশের স্বল্পখ্যাত লোক, যাঁরা পদে পদে ভৃত্য, সেবক ও সহকারীর কাঁধে ভর দিয়ে চলেন, সেই সব অন্তঃসারহীন অসহায়দের উচিত এখানে এসে কবির প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা লক্ষ্য করা। এতে তাঁদের চৈতন্য হত!

যখনকার কথা বলছি, তখন কবির বয়স পঁচাত্তর পেরিয়ে গেছে—বয়সের ভারে তাঁর কোমর গেছে কতকটা বেঁকে, স্বচ্ছন্দ গতিতে ইতস্ততঃ চলাফেরা করতে পারেন

না—তখনো তিনি পাবতপক্ষে অপ্রয়োজনে কারুকে খাটাতেন না। ছোটখাটো কাজ যতটা পাবতেন নিজেই সেবে নিতেন—অন্যেবা বাধা দিলে বলতেন—'শরীব তো একটা যন্ত্র, চালিযে না বাখলে মবচে ধববে যে'। একদিন কি একটা জিনিষ খুঁজে বেব কবতে গিযে হঠাৎ পড়ে গেলেন। এ নিযে সকলে যখন অনুযোগ সুরু কবলেন, কারুকে ডাকেন নি কেন বলে, তখন তিনি একটু হেসে বললেন, 'প্রতি কথায হাঁক-ডাক কবে একে তাকে উদ্ব্যস্ত কবে তোলাব মধ্যে কি একটা কাপুরুষতা নেই? সেই পবশ্রম-জীবিতা আমাব কোনদিন সহ্য হয় না।' প্রায আশী বছবেব বৃদ্ধের মুখেব কথা।

এবাব তাব অদ্ভুত সহনশীলতাব কথা বলি। একদিন তাঁব অল্প একটু জ্বব হয়েছে—বসে আছেন সকাল বেলা পাযেব ওপব শাদা একটা শাল চাপা দিযে, হঠাৎ খবর এলো কযেকজন বিহাবী সাহিত্যিক এসেছেন তাঁব সঙ্গে দেখা করতে এবং সত্যপ্রকাশিত কি এক সেট বই সম্বন্ধে কবিব অভিমত প্রার্থনা কবতে। তাঁব সহযোগীদেব মধ্যে একান্তে একটু আলোচনা চললো, এই প্রতিনিধিদলকে এখনি প্রবেশাধিকার দেওযা হবে—না, অপেক্ষা কবতে বলা হবে। কবি কেমন কবে জানি না টেব পেলেন

জিনিষটা। বললেন, 'ডাকো হে ডাকো ওঁদের। এতটা এসেছেন—বৃথা ফিরিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?' এলেন তাঁরা জনা চার-পাঁচ, সকলেই বসে রইলেন শ্রদ্ধাবনত নিশব্দে—শুধু একজন (তাঁর গলায় যেমন আওয়াজ, বলায় তেম্নি তোড়—কোথাও পূর্ণচ্ছেদ দেন না ভদ্রলোক) বোধ কবি দলের মুখপাত্র তিনি, সুরু করলেন তাঁর বক্তব্য—চললো কথার পর কথা—কোথায় শেষ কে জানে!

আশে-পাশের যাঁরা ছিলেন, সকলেই অস্থির হয়ে উঠলেন, কিন্তু কবির বিরক্তি নেই। অবশেষে জানিয়ে দেওয়া হল তাঁকে যে কবির জ্বর হয়েছে—শুনে তিনি ঘ্যাঁচ করে একবার ব্রেক কষলেন, কিন্তু তার পরই আবার one thing more বলে সুরু করলেন। যখন চলে গেলেন ওঁরা, কবি একটু হেসে বললেন—'প্রায় জখম করবার দাখিল। বাক্যের আঘাতে দেহ ক্লিষ্ট হয়—দেখছো তোমরা?' অসুস্থ শরীরে এত বড় উপদ্রব এমন অমায়িক চিত্তে সহ্য করা আমাদের পক্ষেও অভাবিত।

আর একদিন—তখন কবি ব্যাপৃত একটি নাট্য রচনায়—নিজেই গান বাঁধছেন, নিজেই সুর দিচ্ছেন এবং তাঁর আশেপাশে বসে সঙ্গীতভবনের কর্ম্মীরা সেই সুর তুলে নিচ্ছেন—এমন সময় একটু দূরে এসে দাঁড়ালেন এক

ভদ্রলোক, ওখানকারই আশ্রমিক একজন। কবি লক্ষ্য করে বললেন, 'কি হে, একটা কিছু বলতে চাও বোধ করি।' তিনি সবে পড়ার চেষ্টায় ছিলেন—ধরা পড়ে গিয়ে বললেন, 'আজ্ঞে শরীরটা ·।' কবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বলো বলো কি ব্যাপার। আমি ত শুধু কবিই নই, কবিরাজও—একটা ওষুধ বাৎলে দোব এখনি তোমায়।' সমস্ত শুনে দিলেন তাঁকে একটি বায়োকেমিক ওষুধ।

অনেকে বোধহয় জানেন যে কবি ছোট ছোট ব্যাপারে নিজেই ডাক্তারী করতেন। তাঁর হাতের কাছে সর্ব্বদাই থাকতো কালো মরক্কো মোড়ানো একটি ওষুধের বাক্স ও দু-একটি চিকিৎসার বই। সময় অসময়ে দু-এক বড়ি করে নিজে খেতেন, অন্যকেও দিতেন। ওষুধ চাইতে এলে তাই তিনি অতিশয় খুসী হতেন। কিন্তু তাই বলে গীতিনাট্য রচনার সময় যখন তিনি রয়েছেন গানের মৌজে, সেই সময় বাধা দিয়ে ওষুধ চাওয়াটা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করা সহজ নয়। অন্য কেউ হলে এতে বিশেষ বিরক্ত হতেন।

সহনশীলতার এই দুটো মাত্র ঘটনা আমি বললাম। কিন্তু ঘরোয়া জীবনে প্রতি পদে পদেই দেখেছি আরো অনেক ছোটখাটো ঘটনা। কত বাজে লোকের বাজে

তর্ক, অকর্ম্মণ্যের অসার অজুহাত, উদ্দেশ্যপরায়ণ ধূর্ত্তের ভণ্ডামিপূর্ণ প্রণতি তিনি অবাধে বরদাস্ত করতেন। বুঝতেন সবই, কিন্তু বোঝাতে চাইতেন না। খুব বেশী উত্যক্ত হয়েছিলেন একদিন এমনি একজনের ক্ষমাহীন অশিষ্টতায়। চলে যেতে বললেন, 'অসংস্কৃত মন, অপ্রবুদ্ধ দৃষ্টি, আঘাত দিতেও যে বাধে!' কোন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর পুত্র—তিনি তখন মস্তিষ্ক বিকারে আক্রান্ত—একদিন সুর সহযোগ তাঁকে শোনাতে গিয়েছিলেন দেশী হাপু গান ও অবিকল সেই সুরে তার স্বকৃত অনুবাদ। অটল স্থৈর্য্যের সঙ্গে কবি শুনলেন—একটু পরে বললেন, 'গান বটে, একেবারে মেসিনগান'! সে সময় কবি লিখছিলেন তাঁর বিখ্যাত বিশ্ব-পরিচয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের কপি।

—৪—

ববীন্দ্রনাথেব সামাজিক সহৃদয়তার খুব বড় একটা দিক প্রকাশ পেতো তাঁব চিঠি-পত্র লেখার অভ্যাসে। প্রতিদিন চিঠিই কি কম আসতো তাঁব নামে—দেশ ও বিদেশেব নানাস্থান থেকে, নানা জনেব দাবী-দাওয়া বহন কবে! প্রত্যেকটি কবি স্বহস্তে খুলতেন, পডতেনও প্রত্যেকটি। এব মধ্যে যেগুলো বৈষযিক চিঠি, অর্থাৎ বিশ্বভাবতী সংক্রান্ত, সেগুলি চলে যেত প্রাইভেট সেক্রেটাবীব দপ্তবে—আর ব্যক্তিগত চিঠিগুলি তিনি বাখতেন নিজেব হাতে, নিজেই দিতেন তার উত্তব। এই উত্তব দেওযাব ব্যাপারে তাঁব কোন পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না—প্রসঙ্গাপ্রসঙ্গেবও মুখ চাইতেন না তিনি।

নাবালক স্কুলেব ছেলে, অটোগ্রাফ-লিপ্সু কলেজেব মেযে, স্বল্প শিক্ষিতা অন্তঃপুবেব বধু, অমার্জ্জিত বুদ্ধি গ্রাম্য যুবক যে কেউ তাঁকে চিঠি দিতো, সেই পেতো তাঁব উত্তব—দু-লাইন, দশ লাইন যাহক কিছু লিখে তিনি তাকে তৃপ্ত কবতেন। যাবা জরুরি বিষয় নিযে চিঠি লিখতো, তাদেব ত কথাই নেই। সময় সময় মনে হত, তাঁকে চিঠি দিয়ে উত্তব পায় নি, এমন অভাজন বোধ কবি দেশে কেউ নেই। এই সব চিঠিব বেশীব ভাগই লেখা

হত বিনা প্রযোজনে। অনেকেবই ভেতবে ভেতরে থাকতো যেন তেন প্রকাবে কবির একটি হস্তলিপি সংগ্রহ কবাব মতলব। ভেবেচিন্তে যাহক একটা প্রসঙ্গ খাড়া কবে তাই তাবা হাজিব হত তাঁব কাছে। কাকব কাকব আবার থাকতো ছুতোয-নাতায কোন-না-কোন বিষয সম্বন্ধে তাঁব মত আদায় কবে নেওযাব ফন্দী। সবাই ভাবতো, কবি বোধহয আসল উদ্দেশ্যটা ধবতে পাববেন না। কিন্তু মজা এই যে তিনি সবই বুঝতেন এবং বুঝেই তাদেব ইচ্ছা পূবণ কবতেন। সাধারণত দেখেছি, এই ধবণের ছেলেমি কবতো ছেলেবা—তাবা হযত মনে কবতো, অত বড় মানুষ তিনি, একটা কোন জুতসই অজুহাত নিয়ে উপস্থিত না হলে উত্তব দেবেন কেন?

একটি ছেলে একবাব লিখেছিল তাঁকে, ডিম জিনিষটাকে আমিষ বলা হয কেন? নিবামিষ বললে ক্ষতি কি হয? কবি উত্তবে লিখলেন তাকে, 'বটেই ত! ওব গাযে আঁশ দেখেছি বলে ত মনে হয় না। দিব্যি গোলগাল—খাসা আলুব মতোই ত!' আব একটি ছেলে লিখেছিল, তার ভাবী ইচ্ছা স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দেয—কিন্তু বাবা-মার তাতে প্রগাঢ় আপত্তি, তাই ইতি-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণেব জন্যে তার একটা পরামর্শ চাই

এবং সেটা দিতে হবে কবিকে। কবি লিখলেন 'বাবা-মার কথা শুনো—সেটাও কোন বিদেশী আন্দোলনের পর্য্যায়ে পড়ে না।'

আসলে উভয়েরই দরকার ছিল কবির একটি করে হস্তাক্ষর। তারি জন্যে ছেলেবুদ্ধিতে সবচেয়ে জটিল 'জিজ্ঞাস্য' যা তাদের মাথায় এসেছিল, তাই নিয়ে তারা দরবার করেছিল তাঁর কাছে। মর্ম্মজ্ঞ কবি বুঝেছিলেন, তাই বঞ্চিত করেন নি। মেয়েরা কিন্তু এ ধরণের ফন্দী ফিকিরের ধার ধারতো না—তারা সোজাসুজি তাঁর কাছে করতো রকমারি আব্দার—কারুকে তার নামের ওপর একটা কবিতা লিখে দিতে হবে, কারুক একটা ধাঁধা বানিয়ে দিতে হবে—কারুকে দিতে হবে জন্ম-তিথি উপলক্ষে খুব ভালো একটা আশীর্ব্বাণী। পেতো সকলেই —এক এক মিনিটে তৈরী হয়ে যেতো এক একটি কবিতা—আর কি চমৎকার কবিতা সে সব!

শান্তা বলে একটি মেয়ে একবার তাঁকে লিখেছিল, তার ভারী আগ্রহ, সে কবিতা লেখে, কিন্তু কি দুঃখের কথা, কিছুতেই মিল আসে না তার হাতে! এই বলে সে তুলে দিয়েছিল একটা লাইন—

'সারাদিন বসে আছি জানালার ধারে'

এবং কবিকে ধরেছিল, এই লাইনটা ধরে তাঁকে একটা পুরো কবিতা বানিয়ে দিতে হবে। রবি লিখলেন—

'সারাদিন বসে আছি জানালার ধারে,
উদাস ফাগুন হাওয়া ডাকিছে আমারে।
বাইরে চাঁপার বনে লাগে সেই হাওয়া—
মনে মনে জাগে সাধ বসে গান গাওয়া!'

—লিখেই কি মনে হল কবির! আর এক লাইন বানালেন তিনি—

'আকাশে মেঘের তরী চলে ভেসে ভেসে'

—তারপর লিখলেন, 'এটার সঙ্গে এক লাইন তুমিই মিলিয়ে নিও।'

এই সব ছোট ছেলে-মেয়ের ছেলেমানুষী চিঠির এমন আন্তরিকতাপূর্ণ জবাব কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দিয়ে থাকেন, এ আমি আর শুনিনি। অন্ততঃ আমাদের দেশে এর নজির নেই। ছোটরা ছোট বলেই এদেশে উপেক্ষিত। এই উপেক্ষার দরুণ ছোটরাও কোনদিনই বড়দের কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। কিন্তু শুধু ত ছোটরা নয়, বড়রাও তাঁর প্রতিদিনের অনেকটা সময় নিতেন চিঠি-পত্র লিখে এবং লিখিয়ে। আর সে-সব চিঠিরও বৈচিত্র্য কম নয়।

বেশীর ভাগ স্থলে মনে হয়েছে, তারো আদি প্রেরণা অনেক সময়ই প্রয়োজন নয়, কৌতূহল! কোন ভদ্রমহিলা একবার লিখলেন—তাঁর একটি ছেলের পিঠে একটি মেয়ে হয়েছে এবং মেয়েটি বেশ ফুটফুটে ফর্সা—একটা নাম দিয়ে দিতে হবে তার—কবি লিখলেন, দাও তার নাম শুভ্রা। একটি যুবক জানালো একবার যে তারা দশজনে মিলে একটা সঙ্ঘ গড়েছে—কি নাম দেওয়া যেতে পারে সেই সঙ্ঘের তা নিয়ে দশজনের দশ রকম মত। কবিকে একটা সমাধান করে দিতে হবে। কবি জানালেন, দিয়ে দাও দশমিকা নাম।

পণ্যদ্রব্যের নাম, সঙ্ঘ-সমিতির নাম, ছেলে-মেয়ের নাম—রকমারি নামকরণের আমন্ত্রণ আসতো তাঁর কাছে। আর আসতো জন্মদিন, বিবাহ, উদ্বোধন—ইত্যাদি উপলক্ষে আশীর্ব্বাণীর আহ্বান। আট আনা রকম চিঠিই ছিল এই সব। সম্ভব হলে সে-দিনই, নেহাৎ না হলে, তার পর দিনই কবি দিতেন সমস্ত আহ্বানে সাড়া। বিরক্তি প্রকাশ করতেন না, অন্যের কাছে দীনতা-মূঢ়তা উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে লেখক-লেখিকাকে লজ্জা দিতেও চাইতেন না। সময় সময় প্রগাঢ় পাগলামিপূর্ণ চিঠি আসতো—কিন্তু সেগুলোও উপেক্ষিত হত না। একজন

একবার লিখেছিলেন, 'শুনেছি দাড়ি রাখলে মানুষ দীর্ঘায়ু হয়। আপনি দাড়ি রেখেছেন—সুতরাং এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি জানিতে চাই।' কবি জবাব দিলেন, 'দাড়ি রেখেছি এবং দীর্ঘায়ুও হয়েছি—জানিনা দুয়ের মধ্যে কোন কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কিনা। কিন্তু বিপদ এই যে যারা স্বল্পায়ু হয়, দাড়ি তাদের বাহুল্য অর্জ্জন করতে পারে না—কাজেই উল্টো দিক থেকে প্রশ্নটির মূল্য যাচাই করবার উপায় নেই।' এক ভদ্রলোক জানতে চেয়েছিলেন, কবি ভূতে বিশ্বাস করেন কি না। প্রসঙ্গ-ক্রমে জানিয়েছিলেন যে তিনি নিজে ত বিশ্বাস করেনই, এমন কি দেখেছেনও। কবি জবাব দিলেন 'বিশ্বাস করি না করি, তার দৌরাত্ম্য টের পাই বৈকি মাঝে মাঝে। সাহিত্যে পলিটিক্সে সর্ব্বত্রই এক এক সময় তুমুল দাপাদাপি জুড়ে দেয় ওরা। দেখেছিও অবশ্য—দেখতে শুনতে কিন্তু ঠিক মানুষেরই মতো!'

সাংসারিক বিচার-বুদ্ধি নিয়ে দেখলে এই সব চিঠিকে বাজে চিঠিই বলতে হবে। এ রকম চিঠি পেলে আমরাই বিরক্ত হই—শ্রদ্ধা ত দূরস্থান, মমতার সঙ্গেও নিতে পারি না এ সব জিনিষ। মনে হয় যেন স্পর্দ্ধা—যেন বোকামি দিয়ে অপমান করবার কৌশল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

এগুলিকে তুচ্ছ মনে কবতেন না—তিনি এব ভেতরই পেতেন অনেক কিছু। কখনো হাসি-তামাসাব, কখনো উপদেশ-পবামর্শেব, কখনো বা স্নেহ-মমতার পথ্য পবিবেষণ কবে তাই তিনি এই সব জিনিষকে ববণীয় করে নিতেন। প্রযোজনীয় প্রসঙ্গ নিযে যাঁবা চিঠি-পত্র লিখতেন, স্বভাবতই আশা করা যেতে পাবে যে তাঁবা উত্তব পেতেন—সেটা পাওযা এমন কিছু বিস্ময়কবও নয, (যদিও এদেশে কদাচিৎ বড মানুষদেব কাছ থেকে সে বকম উত্তব পাওযা যায)।

কিন্তু এই সব ছেলেমানুষী, এই সব বাজে কথা, এই সব অখ্যাত লোকেব অর্থহীন জিজ্ঞাসা—এ সবেব সম্বন্ধেও স্নেহশীল সুবিবেচনাব কার্পণ্য ছিল না তাঁব। প্রযোজনীয বিষয নিযে যাঁবা চিঠি-পত্র লিখতেন তাঁব কাছে—বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত চিঠিব কথাই বলছি—তাঁদেব সম্বন্ধে তাঁব আচবণ কি বকম ছিল, এবাব বলি। এক ভদ্রলোক একবাব জানিয়েছিলেন তাঁকে যে তাঁব একমাত্র ছেলে লেখাপড়া শিখে উপার্জ্জন কবতে আবম্ভ কবেছে, কিন্তু পিতা-মাতা সম্বন্ধে তাব অণুমাত্র দাযিত্ববোধ নেই—গোপনে সে একটি মেযেকে বিবাহ কবেছে, যাব পূর্ব্ব-পবিচয় সম্মানজনক নয় এবং তাকে

নিয়েই পৃথকভাবে জীবন-যাপন করছে। বহু প্রত্যাশায় মানুষ করে তোলা ছেলের এই মতি-বিভ্রমে ভগ্নহৃদয় হয়ে ভদ্রলোক সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন কবির কাছে—কবি দিলেন তাঁকে দীর্ঘ একটি উত্তর। সুগভীর সমবেদনার সঙ্গেই এমন কয়েকটি সদুপদেশ দিলেন, যা এখনকার প্রত্যেক পিতা-মাতারই প্রনিধানযোগ্য।

কথাগুলো সংক্ষেপে বলি—বয়স্ক এবং উপার্জ্জনশীল পুত্রের কাছে পিতা-মাতার প্রত্যাশা স্বাভাবিক। পুত্রেরও সেই প্রত্যাশা পূরণ করা নৈতিক কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে, যেখানে যথেষ্ট সদিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্র দায়ে পড়ে পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে—যা হয়েছে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে। যাকে সে ভালোবেসেছে, তাকে নিয়ে নীড় রচনা করেছে, কাজে কাজেই পিতা-মাতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন হয়েছে এবং সম্ভবত তার সঙ্গতি এমন নয় যে এরপর অন্যপক্ষ সম্বন্ধে সে আর আর্থিক সুবিবেচনা করতে পারে। এ অবস্থায় পিতা-মাতার কর্ত্তব্য, প্রসন্ন মনে ওদের এই আত্মস্বতন্ত্র সংসার গঠন অনুমোদন করা, আশীর্ব্বাদে ও শুভেচ্ছায় ওদের যাত্রা-পথ অবারিত করে দেওয়া। মেয়েটি সম্বন্ধেও তিনি মমতাময় মন্তব্য করেছিলেন দু-একটি এবং সর্ব্বশেষে

বলেছিলেন, 'জগতে কোন মেয়ের ভালোবাসাই উপেক্ষার নয়—যদি সত্যিকার ভালোবাসা দিয়ে থাকে সে, তাহলে সেই হবে ছেলেটির জীবন-পথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়।' সুন্দর নয় কি? সুন্দর বলেই এই দীর্ঘ চিঠিটির সারমর্ম্ম দিলাম এখানে।

আর এক ভদ্র মহিলা—অন্তঃপুরের অন্ধকারে অবরুদ্ধ থেকেও তাঁর মনে জেগে ওঠে আচার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নানা প্রতিকূল জিজ্ঞাসা—কবিকে তিনি লেখেন পরের পর কতকগুলি চিঠি। লেখা-পড়া তাঁর বেশী ছিল না, কিন্তু চিন্তার ভেতর ছিল এমন একটা কুণ্ঠাহীন বলিষ্ঠতা, এমন একটা সতেজ আত্ম-নিরীক্ষা যে কবি মুগ্ধ হন এবং একের পর এক করে দিতে থাকেন চিঠির উত্তর। অসংখ্য চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে—একত্র সংগৃহীত হলে মস্ত একটা বই হতে পারে। কথাপ্রসঙ্গে বললেন একদিন, 'মনের স্বাস্থ্য ওঁর এমনি অটুট যে এই সমস্ত সন্দেহ ও আশঙ্কার ঝড়ঝাপ্টা ওঁর চিন্তার আকাশকে কোনদিনই আবৃত করতে পারবে না।'

আমার সন্দেহ আছে, অন্য কারুর কাছে আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরচারিণী কেউ এই ধরণের জিজ্ঞাসা নিয়ে হাজির হলে এ রকম উৎসাহ পেতেন কিনা। যেমন কোন

ব্যথিত-হৃদয় পিতাও পেতেন না ও রকম কোন সমবেদনার সাড়া। বৃহৎ মানুষদের বৃহত্তর চিন্তা ও কর্ম্মের আসরে ক্ষুদ্র মানুষদের মনের বুদ্বুদ--এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতূহল—কবে স্থান পেয়েছে ?

সময় সময় এই অকৃপণ চিঠি দেওয়ার অভ্যাস কবির পক্ষে মহা হাঙ্গামার কারণ হত। অনেকে তাঁর স্বভাব জেনে, তাঁর হাত দিয়ে এমন সমস্ত বিষয় লিখিয়ে নিতেন, যার জের ঢের দূর পর্য্যন্ত গড়াতো। কোন কোন স্পর্দ্ধিত ব্যক্তি আবার তাঁর সহজ-লভ্যতার সুযোগে এমন সমস্ত চিঠি লিখতেন, যা আর সকলকে লজ্জা দিত। তিনি কিন্তু গায়ে মাখতেন না। চিঠি দেওয়া নিয়ে অনুযোগ করলে বলতেন, 'চিঠি যে দেয় সে স্বভাবতঃই প্রত্যাশা করে একটা উত্তর। ওটা না দেওয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তির পাতে খাবার না দেওয়ার মতো।' হঠাৎ একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'না আমি আর চিঠিপত্র দিতে পারবো না কাকুকে--শরীরে পোষাচ্ছেনা আমার।' বললেন বটে, কিন্তু পরের দিনই দেখলাম আবার বসে গেছেন কাগজ-কলম নিয়ে এবং সুধাকান্ত বাবু একের পর এক করে চিঠি লেফাপায় ভর্ত্তি করছেন। চিঠি পাওয়া এবং দেওয়া—এ দুটোই ছিল তাঁর জীবনের একটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ।

— ৫ —

খাবার টেবিলে যাঁরা কোন-না-কোন দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়েছেন অথবা তাঁর আহারের সময় উপস্থিত থেকেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর কতকগুলো বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন। এই সমস্ত বিশেষত্ব অবশ্য রবীন্দ্র-চরিত্রের খুব মস্ত বড় কোন দিক উদ্ঘাটিত করে দেখায় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ ব্যক্তির বিশেষত্ব বলেই এগুলো লিখে রাখবার যোগ্য। দু'চারটে বলছি। নানা জিনিষ সাজিয়ে দেওয়া হত তাঁর টেবিলে—এটা থেকে কিছু, ওটা থেকে কিছু, চামচ দিয়ে তুলে তুলে নিতেন। কোনটাই ষোল-আনা খেতেন না, বা আহার ব্যাপারে আমাদের যা প্রচলিত রীতি, তা-ও বড় একটা অনুসরণ করতেন না। হামেশাই দেখেছি—হয়ত গোড়াতেই খেলেন খানিকটা পায়েস, তারপর খেলেন দু'চারখানি আলুভাজা, নয়ত একটু মোচার ঘণ্ট—তারপর হয়ত দুটি দই-ভাত এবং অবশেষে হয়ত দু'খানা লুচি ও একটু ঝোল।

নদীয়া জেলার মানুষ আমি—কিসের পর কি খেতে হয়, ভালো করেই জানি। এই ব্যতিক্রম দেখে অবাক হতাম—একদিন বলেই ফেললাম। হেসে বললেন, 'ওটা তোমাদের একটা অভ্যাসের গোঁড়ামি। তোমরা মনে

করো—রসনার এক এক রকম স্বাদের উপর এক এক ধরণের পক্ষপাত আছে, তার ক্রম-ভঙ্গ হলেই বুঝি আহারের আনন্দ মাঠে মারা গেল।' একটু পরে বললেন, 'আমি মনে করি, শরীর প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—সেটা অভ্যাসের অন্ধতায় ভুলে বসে থাকি বলেই আমরা এক-একটা রীতির দাসত্ব করে চলি।' সবিনয়ে জানালাম যে আহার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও এই রকম অভ্যাস-বিরোধিতা ছিল—আগে দুধ-মিষ্টি খেয়ে, তারপর তিনি এক এক সময় তেতো খেতেন। বিহারীলাল সরকারের বইয়ে পড়েছি।

কৌতুক করে বললেন, 'তুমি দেখছি প্রত্নতাত্ত্বিকদের পিসেমশাই—খুঁজে খুঁজে বার করেছো। জানতাম না। কোন দিন আবার আমার কথাও লিখে বসবে ত?' তারপর বললেন, 'তাতে সুবিধা হবে একটা—লোকে বলবে, বিদ্যাসাগরে আর রবিঠাকুরে অন্তত একটা বিষয়ে মিল ছিল—খেতে বসলে দু'জনেরই বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেতো।'

ওঁর খাওয়া দেখে একটা জিনিষ আমার প্রায়ই মনে হত—এই রকম বেছেগুছে খাওয়ায় কি ভালো করে পেট

ভবে? এ ত খাওয়া নয়, যেন রকমারি খাদ্য-বস্তুর আস্বাদ পরখ করা। বলতেই উচ্চহাস্য করে উঠলেন—'তা ভবে বৈকি, নইলে এত বড় যন্ত্রটা সচল আছে কি করে?' এই ভাবে চেখে খাওয়ার অভ্যাস তৈরী করছেন কেন, তার সমর্থনে বললেন, 'আমাদের দেশে খাওয়ার আদি ও অকৃত্রিম উদ্দেশ্য হল উদরপূর্ত্তি, তাই এটা-ওটা একত্রে জঠরস্থ করে এবং সেই সঙ্গে ঢক ঢক করে খানিক জল খেয়ে আমরা দায় সারি। খাদ্যের যে একটা স্বাদ আছে এবং সেটা যে উপভোগ্য, আর একটু একটু করে তারিয়ে তারিয়ে না খেলে যে সে উপভোগটা কখনোই লাভ হয় না, এ আমাদের ধারণার বাইরে।'

আমাদের আহার্য্যবস্তুর অসারতা এবং আহার-প্রণালীর অবৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতেন তিনি। একটা কথা মনে আছে আমার, যা এপর্য্যন্ত বহু জনকে বলছি—'দারিদ্র্য আছে ঠিকই, কিন্তু বিচার-বুদ্ধির অভাবও কম নেই। যে দামে যে খাদ্য আহরণ করো তোমরা, সেই দামেই তার চেয়ে সারবান খাদ্য পেতে পারো, যদি বেছে নিতে জানো। আর যে পদার্থ থেকে যে খানা তৈরী করো, তারও উন্নতি বিধান করতে পারো অনায়াসেই, যদি উপকরণগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে চেতনার

অভাব না হয়।' কথাটা দামী এবং মেয়েদের, যাঁদের হাতে আমাদের হেঁসেল, এটা স্মরণ রাখা উচিত।

ইতিপূর্ব্বে যে খাদ্য তালিকার উল্লেখ করেছি, তার প্রত্যেকটিই অবশ্য বাঙালী খানা হিসাবে সুপরিচিত—কিন্তু শুধু এইগুলোই তাঁর প্রতিদিনের খাদ্য ছিল না। বহু অপরিচিত জিনিষও স্থান পেতো তাঁর পাতে—বরং তাদের ভীড়ই বেশী করে চোখে পড়তো। একটা গল্প বলি। এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসেছেন—দু'জনকেই খাদ্যবস্তু পরিবেষণ করা হয়েছে সমান করে, বরং অভ্যাগতকে একটু বেশী করেই দেওয়া হয়েছে কোন-কোন জিনিষ। শুধু কবিকে একটা তরকারি মতো জিনিষ আলাদা করে দেওয়া হল, যা থেকে তিনি বাদ পড়লেন। ভদ্রলোক কৌতূহল বশে দেখতে লাগলেন বারবার—ওটা কি পদার্থ। কবি বুঝতে পেরেই বললেন, 'এই ত, এসব পক্ষপাতিত্ব আমি একদম পছন্দ করি না—আমি রবীন্দ্রনাথ, অমনি টপ করে কিনা একটা প্রস্থ আমায় বেশী দিয়ে দিলে! তা এই - ওরে দে দে বাবুকে ঐটা একটু।' দেওয়া হল—মুখে দিয়েই তিনি চমকে উঠলেন, আর কিছু নয়, খাঁটি নিমপাতা বাটা।

নিমপাতা বাটা, পঞ্চতিক্ত, মেথি-ভিজে জল, এম্নি ধারা নানা জিনিষ তিনি খেতেন প্রাত্যহিক আহারের সঙ্গে এবং রীতিমতো তারিফ করেই খেতেন। বলা বাহুল্য এগুলি স্বাস্থ্য-প্রদ উপকরণ বলেই। এছাড়া খাদ্য-বস্তু নিয়ে পরীক্ষা করার ঝোঁক ছিল তাঁর খুব প্রবল। হঠাৎ ঠিক করলেন—সব জিনিষ সিদ্ধ খাবেন—চললো কিছু-কাল সিদ্ধ খাওয়া। পেঁপে সিদ্ধ, কচু সিদ্ধ, মূলো, গাজর, কপি সিদ্ধ। হঠাৎ মনে করলেন, কাঁচা আনাজ খাওয়া ধরবেন—অম্নি সুরু হল কাঁচা খাওয়া—টম্যাটো, মূলো, শালগম নানা জিনিষ খেলেন কিছু দিন। হয়ত শরীরে সইলো না—দু'চার দিন পরে ছেড়ে দিলেন। এই ভাবে নিত্য নূতন খাদ্য, তালিকা রচনা এবং তার পরিবর্ত্তন চলতো। এগুলো তিনি খাদ্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় গবেষণার বই-পুঁথি থেকে খুঁজে খুঁজে বার করতেন—বলতেন, 'প্রয়োগ ও পরীক্ষাকে ভয় করো তোমরা। তাই নূতন নূতন পথে জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করতে পারো না।'

একবারকার কথা বলছি। তখন চলছে অম্নি একটা পরীক্ষার পালা—শুধু শুকনো খাবার (যথা ছাতু, রুটি, খই, মুড়ি ইত্যাদি) খাচ্ছেন কবি। ফলে পাকস্থলী উত্তেজিত হয়েছে এবং নিয়মিত ভাবে বদহজম হচ্ছে।

তাঁকে বাব বাব অনুবোধ কবা হল খাদ্য-তালিকা পবিবর্ত্তন কবতে। বললেন, 'বেশ তাই হবে। কিন্তু এতে প্রমাণ হল না যে পন্থাটা ভুল—আমাব দেহ-যন্ত্রে ববদাস্ত হল না এই পর্য্যন্ত বলতে পাবি।'

এই সব হল তাঁব অবাঞ্ছিত ভোজ্যোপকবণ নিয়ে পবীক্ষা। 'বাঞ্ছিত' উপকরণেবও তিনি বকমফেব কবাতেন প্রচুব। ফবমায়েস দিয়ে নানা সাধাবণ জিনিষ থেকে অসাধাবণ খানা তৈবি কবাতেন।

কোন কোন পত্রিকায় দেখেছি, এক সময় গাব পাতার চাটনি, শোলা কচুব পায়েস—এম্নি সব অদ্ভুত অদ্ভুত বান্নাব বিববণ বেব হত। ববীন্দ্রনাথেব 'বেসিপ'গুলো জানলে ওঁরা আরো ঢেব দিন চালাতে পাবতেন হয়ত এই সব সেক্সন। খেয়ালী কবিব বান্না আবিষ্কাবেবও খেয়াল ছিল—এইটুকুই এব ভেতর মজাব কথা। একদিন বললেন—'জানো সব রকম কলাব মতো বন্ধন কলাতেও আমার নৈপুণ্য ছিল। একদা মোড়া নিয়ে বান্না ঘবে বসতাম এবং স্ত্রীকে নানাবিধ নূতন রান্না শেখাতাম।'

এতক্ষণ কবির যে আহাব বৃত্তান্ত বললাম, সে হল মাধ্যাহ্নিক আহাব—এইটাই ছিল তাঁর সব চেয়ে বড়

আহার। রাত্রে তিনি খুব কম খেতেন—সাধারণত গব্য জাতীয় কোন জিনিষ—যেমন ছানা, নয়ত দুধ, সেই সঙ্গে সামান্য কিছু সন্দেশ, দুএকখানা লুচি বা দুটি যবের ছাতু, আর অল্প ফল-মূল। কোন বিশেষত্ব দেখতাম না। এ ছাড়া সকালে ও বিকেলে বেশ ভালো করেই জলযোগ করতেন। সকালে লেখার টেবিলে বসতেন—কাগজপত্র, চিঠি, দপ্তর, ওরি ভেতর জলযোগ আসতো—সাধারণত কিছু ভাজাভুজি—যেমন চিঁড়ে ভাজা, নয়ত মুড়ি, তার ভেতর টুকরো করে ছড়ানো পাঁপর ভাজা, এই সঙ্গে নারকোল নাড়ু বা একটা কিছু মিষ্টান্ন—পেঁপে, আম বা এম্নি কোন ফল কিছু, আর চা, নয়ত কফি কিংবা কোকো। চা তিনি বেশী খেতেন না, যা খেতেন, তাতেও দুধের পরিমাণই থাকতো বেশী। তিনি পছন্দ করতেন কফি।

প্রাতরাশের সময় তিনি প্রায়ই একে-তাকে ডেকে নিতেন টেবিলে। পানীয় বণ্টনের সময় একদিন আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দে রে ওকে দাক্ষিণ্য সহকারে চা দে। ওরা হল শরতের দল, পেয়ালার বদলে ঘটির মাপে চা খায়।' শরৎ হচ্ছেন শরৎচন্দ্র। একদিন শরৎচন্দ্র কলাইয়ের মগ ভর্ত্তি চা খেয়েছিলেন তাঁর সাম্নে। সেই গল্প বলতেন, আর হাসতেন।

প্রাতরাশের একটু পরেই খেতেন এক গ্লাস সরবৎ—কোন-না-কোন ফলের নির্য্যাস থেকে বানানো হত। আম, কলা, নেবু, রকমারি ফলই ব্যবহৃত হত। বেশীর ভাগই কমলা নেবু। টুকরি ভর্ত্তি নেবু তাঁকে পাঠাতেন মধ্যে মধ্যে দার্জ্জিলিং থেকে একটি মহিলা—কলকাতা থেকেও যেত কোন কোন মুগ্ধ ভক্তের উপহার। এই সরবতের বখরাও পেয়েছি। একটা সরবৎ এখনো ভুলিনি—টম্যাটো থেকে তৈরি। উদ্ভিজ্জ গন্ধযুক্ত এই সরবতের বিরুদ্ধে আমার নালিশ ছিল, বলতে পারি নি সাহস করে। মুখ দেখেই বুঝেছিলেন কবি, বললেন, 'ভালো লাগলো না, বলো কিহে? এ যে অতি উৎকৃষ্ট পানীয়। তাহলে ত দেখছি পান-মার্গে তোমার বেশী অগ্রগতির আশা নেই।' 'অগ্রগতি' তখনকার একটি পত্রিকা—ওতে লিখতাম বলেই কথাটা বলেছিলেন।

বৈকালিক আহার করতেন তিনি সাধারণত চারটেয়—তখনকার মেন্যুতে ফলের স্থানই সবার ওপরে। যাহক একটা উষ্ণ পানীয় থাকতো সেই সঙ্গে। ফলের মধ্যে আমই ছিল তাঁর সব চেয়ে প্রিয়, তারপরই কমলা—প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন তিনি এই দুই দুটি ফল সম্বন্ধে। কাঁঠালের কথা তুলেছিলাম একদিন—বললেন, 'ঘন দুধে

খাজা কাঁঠাল যেন 'অমিত্তির'। আর কত বড় সালসা! খেয়ো হে খেয়ে পাটি পেড়ে শুয়ে থেকো—আরাম পাবে।'

এখানেই শেষ করছি কবির ভোজন-কাহিনীর বিবরণ। একটা কথা বোধ হয় অনেকের মনে উঠেছে—কবি মাছ, মাংস, ডিম, এসব খেতেন কিনা? এই সব খানা সম্বন্ধে তাঁর মত কি ছিল? একদা এসব জিনিষ খেতেন তিনি—কিন্তু আমার আমলে আমি তাঁকে দেখেছি প্রায় ষোল-আনা নিরামিষাশী। আর নিরামিষ পর্ব্বের আহার সম্বন্ধেই তাঁর বেশী অনুরাগও দেখেছি। আমিষ ও নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে সুধাকান্ত বাবুর তর্ক মনে পড়ে—সুধাকান্ত বাবু ঘোর মাংসাশী, শুনেছি বাজী ফেলে বাঘের মাংস পর্য্যন্ত খেয়েছিলেন—স্বভাবতই আমিষাহারকে সমর্থন করছিলেন তিনি এবং দেখাচ্ছিলেন, জীব-পর্য্যায়ে মাংসাশীরা তৃণ-ভোজীদের চেয়ে কত বেশী বিক্রমশালী। কবি বললেন, 'বটে, বটে! তাহলে হাতী, ঘোড়া, উট, মহিষ এদের তোমরা জীবের মধ্যেই গণ্য করো না? ওরা মাংস খায় বলে ত শুনি নি।' একরোখা তর্কের মুখে ওদের কথা কারুর মনেই পড়ে নি—সকলেই ভেবেছিলেন একমাত্র গরুর কথা। অপ্রস্তুত হাসির রোল উঠলো। কবি বললেন, 'এই ত! নিরামিষের কাছে আমিষ হেরে গেল।'

—৬—

এবার রবীন্দ্রনাথের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কিছু বলি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের প্রচলিত পোষাক কালে-ভদ্রে পরতেন—তাঁর প্রাত্যহিক পোষাক ছিল পাযজামা ও ঢিলে পাঞ্জাবী অথবা আলখেল্লা। অনেকেই তাঁকে এই পোষাকে দেখেছেন আশা করি। যাঁরা দেখেন নি, তাঁরা অন্তত ছবিতেও দেখেছেন। কেউ কেউ ভাবতেন, তাঁর এই ধরণের পোষাক-নির্ব্বাচন কবিজনোচিত খেযাল ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এ খেযালের বিরুদ্ধে নালিশও ছিল অনেকের। রবীন্দ্রনাথের মতো লম্বা-চওড়া কান্তিমান পুরুষকে এই পোষাকে যে চমৎকার দেখাতো এতে কারুর দ্বিমত ছিল না—কিন্তু এই সজ্জার পেছনে তাঁরা মস্ত বড় একটা বিজাতীযতার গন্ধ পেতেন। বলতেন, উনি যে বাঙালী নন, এই কথাটাই যেন ঐ পোষাকের ভেতর দিয়ে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানতেন সেটা। একদিন বলেছিলেন সে কথা—'ঠাকুর পরিবার একদা নবাব-সরকারে প্রভাবশালী ছিলেন, তারি দৌলতে মোগলাই সাজ-সজ্জা ও আদব-কায়দা তাঁদের ঘরে ঢুকে পড়ে। পড়েছিল আরো অনেক পরিবারেই—কিন্তু

ইংরেজ আমলে তাঁরা চটপট মোগলাই কেতা বদলে বিলেতী কেতা অভ্যাস করে ফেললেন—ঠাকুররা বিলেতী শিক্ষা-সহবৎ দস্তুর মতোরেক গ্রহণ করলেও, সাজ-সজ্জাটায় কিন্তু রক্ষণশীল থেকে গেলেন।' প্রসঙ্গক্রমে হাটখোলার দত্তদের সঙ্গে তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের তুলনা করে ছিলেন। বলেছিলেন একটা কথা খুব সুন্দর—'নবাগত শাসক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ঠাকুরদের মনের গভীরে কোথাও ছিল একটা প্রকাণ্ড বিরুদ্ধ ভাব, তাই তাঁরা নূতনের বন্যায় ভেসে যান নি। একটা জায়গায় খাড়া থেকে গিয়েছিলেন—পোষাকটা তার বাহ্য অবলম্বন, কিন্তু আসল জায়গাটা হল তাঁদের মন। এই মন থেকেই ধুঁইয়ে উঠেছিল প্রথম স্বদেশীয়ানা, যাতে একদা আমাকেও প্রবেশ করতে হয়েছে।' বলা বাহুল্য যে বাংলা দেশে স্বাদেশিকতা বোধের প্রবর্ত্তকরূপে যাঁদের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, ঠাকুর পরিবার তাঁদের মধ্যে যেমন প্রধান, তেমনি নবযুগ ও নবীন চিন্তা-ধারার উদ্বোধক রূপেও তাঁরাই অগ্রগণ্য। সুতরাং ঠাকুর পরিবারের এই পোষাক নির্ব্বাচন নিয়ে খুঁত ধরবার কিছু নেই—বরং এর ভেতর আমি আর একটা উচ্চতর উদ্দেশ্যেরই ইঙ্গিত পেতাম।

বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমানে জড়িয়ে যে একটা

যৌথ সংস্কৃতি আছে (যেটা রাজনীতিক বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে ইদানীং আমরা স্বীকার করি না), ওঁরা সেটা প্রাত্যহিক জীবনে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাইতেই মুসলমান আমলে প্রবর্ত্তিত পোষাককে ওঁরা পারিবারিক পরিচিতির দিক থেকে লজ্জার মনে করেন নি। একদিন কথা হচ্ছিল এই নিয়ে। কবি বললেন, 'মুসলমানের প্রবর্ত্তিত হাজার হাজার শব্দ বাংলা ভাষায় নিত্যকার ব্যবহারে চলছে, তাদের আনা খাদ্য-পানীয় ফল-ফুল দিব্যি জলাচরণীয় হয়েছে। তবে কি আপত্তি শুধু তাদের পোষাক সম্বন্ধে?' একটু পরে বললেন, 'অবশ্য পোষাকে শুধু উপযোগিতাটাই বড় কথা নয়—তার রুচিকরতাও লক্ষণীয়। মুসলমানী পোষাকের কতকাংশ যে সেদিক থেকেও রমণীয়, এ স্বীকার করবে আশা করি।' স্বীকার আমরা করি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কবিও ধুতি-পাঞ্জাবী এবং উড়ানির সৌন্দর্য্য পূর্ণভাবেই স্বীকার করতেন।

এই বাঙালী সজ্জাটা ঢিলে-ঢালা—শ্রমসাধ্য কাজের পক্ষে অনুপযোগী—দৌড়-ধাপে একেবারেই অচল—তা সত্ত্বেও এর ভেতর বেশ একটি সহজ স্বচ্ছন্দতা আছে বলেই তিনি এর গুণগান করতেন। বলতেন, 'আমাদের বহিঃ-

প্রকৃতি ও মেজাজের সঙ্গে ওর খাসা সামঞ্জস্য দেখতে পাই—যেন প্রচুর অবসর, প্রচুর আলস্যের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছে জীবনকে!' শীত-প্রধান দেশের আঁটসাঁট পোষাক তাদের আবহাওয়ার উপযোগী, তাদের জীবন-যাত্রার পক্ষে তার সার্থকতাও কম নয়—কিন্তু আমাদের দেশে কল-কারখানা ও কাজ-কারবারের বাইরে তার ব্যবহার কবির অভিপ্রেত ছিল না। বরং ওর ভেতর তিনি একটা কৃত্রিমতার একটা অনাবশ্যক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিরই পরিচয় পেতেন। বলতেন, 'য়ুরোপীয় জীবনের অবিরাম গতিশীলতা আমাদের জীবনে এলে, আপনিই তার জন্যে উপকরণের বদল হবে—তাতে বলার কিছু নেই। কিন্তু সব কিছু অবিকৃত রেখে য়ুরোপীয় সাজ-সজ্জার কসরত করা কেন? যাদের হাতে আমরা উপেক্ষিত, তাদের কাছে আনুগত্য জ্ঞাপন করা, আর যারা আমাদের আশে-পাশের মানুষ তাদের থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখানো ত!' আমাদের তথাকথিত সাহেবদের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া বোধকরি মন্দ নয়।

হ্যাঁ, খাঁটি বাঙালী পোষাক রবীন্দ্রনাথকে পরতে দেখেছি দু'চার বার—২৫শে বৈশাখের জন্মতিথি উপলক্ষে

যখন তিনি আম্রকুঞ্জে আসতেন, তখন কোঁচানো গবদের ধুতি ও গিলে-করা পাঞ্জাবী পরে আসতেন, গলায় নিতেন ব্যাটিকের কাজ করা ধোয়া উড়ানি—পায়ে পরতেন কটকি চটি, অথবা ফুলদার নাগরা। সে মূর্ত্তি তাঁর যে দেখছে, সে-ই জানে কি সুন্দর দেখাতো তাঁকে। ৭ই পৌষের উৎসবে 'মন্দিরে' যখন সারমন দিতে আসতেন, তখনো আসতেন এই বেশে। একবার (তখন চীন-জাপান যুদ্ধ সবে বেধেছে) অস্ত্রবল ও আত্মিক বলে তুলনা করে বক্তৃতা দিতে দিতে উঠে দাঁড়ালেন কবি—শুভ্র শ্মশ্রু উড়ছে, উত্তরীয় উড়ছে, চন্দনচর্চ্চিত ললাট কুঞ্চিত-প্রসারিত হচ্ছে কথার তালে তালে—সেই সঙ্গে দুলছে আভূমি-প্রলম্বিত কোঁচা—এমন অপূর্ব্ব ভঙ্গিমাময় অভিব্যক্তি তাঁর আর দেখিনি কোনদিন। মনে হয়েছিল, আজকের এই বিশেষ মুহূর্ত্তটির জন্যে, এই বিশেষ রূপটির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে সত্যিই দরকার ছিল তাঁর এই একান্ত বাঙালী পোষাকের। এণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন—অভিভাষণান্তে কবি যখন নেমে আসছেন, উচ্ছ্বাস সহকারে তিনি বললেন, 'Splendid' এবং তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন একগাছি আকন্দ ফুলের মালা। পরে বলছিলেন বৃদ্ধ, He looked exactly like Christ।

প্রাত্যহিক জীবনে কবি কি পোষাক ব্যবহার করতেন, তা আগেই বলেছি—পায়জামা ও আলখেল্লা। ইদানীং চলৎশক্তির শ্লথতা হেতু পাযজামা ছেড়ে তার বদলে পরতেন একটা আধা-লুঙ্গি আধা-পেটিকোট ধরণের জিনিষ, যা ঝুলে থাকতো পায়ের পাতা পর্য্যন্ত। আলখেল্লাটা হত তাঁর নিজের ফরমায়েস অনুসারে—জানুর নীচে পর্য্যন্ত ঝুল, ঢোলা হাতা, বোতামের চেয়ে ফিতে দিয়ে গলাবন্ধ করাবই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। আমি দেখেছি তাঁকে বেশীর ভাগ সময়ই কমলানেবু রঙের খদ্দর ব্যবহার করতে—মটকা বা গরদও পরতেন মাঝে মাঝে, কিন্তু বেশী না।

শীতকালে সময় সময় কালো বা ছাই রঙের একটা গরম জোব্বা পরতেন—অনেকটা বিলেতী গ্রেট কোট আর ভারতীয় সালোযারের মিশেলে তৈরি একটা নূতন ধরণের জামা। তার উপর শাল নিতেন একখানা। তবে শীত-গ্রীষ্ম কোন সময়ই আবহাওয়ার আতিশয্য তাঁকে অভিভূত করতে দেখিনি। প্রচণ্ড গরমেও দেখেছি অবলীলায় পুরু খদ্দর পরে গভীর অভিনিবেশ সহকারে লেখা-পড়া করছেন—আবার দারুণ শীতেও সূতি কাপড়ে বেশ আছেন—এ দৃশ্য হরদম দেখেছি। বলতেন, 'শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখ বোধ

স্তম্ভিত হয়েছে হে। বলতে পারো কূটস্থ।' ঠাট্টা করে বলতেন, কিন্তু বুঝতাম পরম সত্য।

মেয়েদের পোষাক সম্বন্ধে কবির রুচির কথাটা বলেই এবারকার বক্তব্য শেষ করবো। শান্তিনিকেতন আশ্রমে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মেয়ে ..তাঁদের সকলকেই পরতে হয় বাঙালী শাড়ী-সেমিজ, এটা কবির নির্দেশ। বলতেন, 'মেয়েদের কল্যাণ-লক্ষ্মী রূপের সঙ্গে আমাদের এই পোষাকের বেশ একটি সঙ্গতি দেখতে পাই। ওদের অন্য কোন পোষাকেই আমার চোখে ভালো দেখায় না, মনে হয় যেন ছন্দ-ভঙ্গ।' এবিষয়ে মতভেদ বড় একটা হত না। একদিন বলেছিলেন, 'কিন্তু মেয়েদের এই বিশেষ ধরণের সজ্জাটাও খুব বেশী দিনের নয়। ওটা আমারি ভ্রাতৃ-বধূ আমদানি করেছিলেন গুজরাট থেকে।' আর পুরুষের আধুনিক সজ্জাটা? জিজ্ঞাসা করতে কবি হেসে বলেছিলেন, 'ওটা গড়াতে গড়াতে গড়ে উঠেছে হে।'

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

— ৭ —

রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্য বচনা কবতেন বা যখন পড়াশুনা কবতেন, তখন কি ভাবে কবতেন, সেই কথা বলবো এবাব। অনেকেব ধাবণা, কবিবা যখন লেখেন, তখন তাঁদেব আশে-পাশেব তুনিযা সম্বন্ধে কোন হুঁসই থাকে না। আব সে হুঁস তাঁবা বাখারও প্রযোজন বোধ কবেন না। কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব ক্ষেত্রে দেখেছি উল্টো। দিবারাত্রি তিনি ব্যস্ত থাকতেন সহস্র বকম কাজ নিয়ে—এবং তারি ভেতব অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলতো তাঁব সাহিত্য-সাধনা। সকাল বেলা শ্যামলীব বাবান্দায তাঁব টেবিল পডতো—সেখানেই প্রাতবাশ সমাধা কবতেন, চিঠিপত্র দেখতেন, অতিথি-অভ্যাগতকে গ্রহণ কবতেন, আব তাবি ফাঁকে ফাঁকে লিখতেন। হযত কবিতা লিখছেন, ইতিমধ্যে এলেন কোন দর্শক এবং আধঘণ্টাকাল নানা আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত কবে দিলেন। কবি কিছুমাত্র অস্বস্তি বোধ না কবে তাঁব সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে চললেন এবং যেই তিনি বিদায নিলেন, অমনি কলমটি তুলে নিযে যেখানে থেকে বন্ধ কবেছিলেন, সেখান থেকে লেখাটি ধবলেন। মনে পডছে, 'কোন সে কালেব কণ্ঠ থেকে আসলো ভেসে স্বব, এ-পাব গঙ্গা, ও-পাব গঙ্গা, মধ্যিখানে

চব'—কবিতাটি লেখাব সময় এই রকম একটা ব্যাপাব ঘটেছিল।

লিখতে লিখতে মাঝপথে বাধা পেলে তাঁব বচনাব কোন ক্ষতি হয কি না জিজ্ঞাসা কবেছিলাম। কবি হেসে উত্তব দিলেন, 'না। অনেক দিনেব অভ্যাসে মনটা এমনি সচল হযে গেছে যে হাতের সহযোগিতা না পেলেও সে থেমে দাঁড়ায় না। যখন বাইবে নিষ্ক্রিয থাকি, ভেতরে তখনো কাজ চলতে থাকে—তাই যেই কলম ধবি, অম্নি এগিযে যেতে পাবি।' নানা হৈ-হৈ হট্টগোল ও বাজে কাজেব মধ্যে ডুবে থেকেও চিন্তা-সূত্র তাঁর ছিন্ন হত না বা লিখনীয বিষযটিব ছোটখাটো আনুষঙ্গিকগুলো তাঁব স্মৃতিভ্রষ্ট হত না, এ সত্যিই বিস্ময়কব লাগতো আমাব।

আমরা যাঁবা সাংবাদিকতা কবি, অনেক কিছু প্রতিবন্ধকতাব মধ্যেই প্রতিদিনেব প্রবন্ধ বচনা কবি। কিন্তু সংবাদপত্রেব প্রবন্ধ—ও হল মোটা কলমেব কাজ, ওর ওপব অনেক ভব সয়। সাহিত্যে কি তা হয? আশ্চর্য্যেব বিষয, ববীন্দ্রনাথেব হাতে সরু কলমও চলতো অবাধে ও অতি অনাযাসে। তিনি নিজেই বলতেন, 'আমি লিখি এটা বাইবের কথা। বলতে পাবো, লেখা আসে ভেতব থেকে। আমি শুধু তাকে অভিব্যক্তি

দিই। কোন কিছুই সেই জন্যে আমাব পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কবতে পাবে না।' চোখের সামনে তিনি লিখেছেন আত্মস্মৃতি কথা, বক্তৃতা, অভিভাষণ, প্রবন্ধ, চিঠি—নানা জিনিষই। উদ্ধৃতি তুলতে বা উদাহবণ দেখাতে পর্য্যন্ত কোথাও তাঁব কোন বই বা নোট দরকার হত না। এমন কি, লিখতে লিখতে থেমে কোন কথা ভেবে নেওযাবও প্রয়োজন দেখিনি কোনদিন। মনে হত, সব যেন তাঁব মনের যন্ত্রশালায সাবি সাবি সাজানো বযেছে—ফবমায়েস মতো ডাক দেওয়া মাত্র তাবা হু-হু কবে বেবিযে আসছে। কবিতা, গান ও গীতি-নাট্য লিখেছেন, পদ্ধতি সেখানেও তাঁর একই।

পাণ্ডুলিপি তাঁব বেশীব ভাগই পবিচ্ছন্ন হত—মুক্তার মতো অক্ষবে, সমশীর্ষক লাইনে, অতিদ্রুত তিনি লিখে যেতেন। আব লিখতেন প্রধানতঃ পেলিকান কলমে ও কাজলকালি কালিতে। যেখানে থেমে যেতেন, সেখানেই কিন্তু সুরু হত কাটাকুটি। সেই কাটাকুটিব মোহ সময সময এমনি মাবাত্মক হযে উঠতো যে লেখার কথা ভুলেই যেতেন—ঘুরিযে ফিবিযে বেঁকিযে চুবিযে সেই কপিটাকে একটা কোন ছবিতে দাঁড করাতে চেষ্টা কবতেন। তাঁর অনেক

ছবিরই জন্ম এইভাবে—কিন্তু ও-কথা পরে বলবো। এই ছবি রচনা করতে করতেই আবার দেখেছি, টপ করে তিনি লিখিতব্য বিষয়টিতে ফিরে এসেছেন এবং বোঁ বোঁ করে লিখে চলেছেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'ওটা একটা খেলা হে। মন বাইরে দাঁড়িয়ে খেলা করে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে করে বেগ-সঞ্চয়। তোমাদের ফ্রয়েড এ সম্বন্ধে কি বলেন?'

'আমাদের ফ্রয়েড' কথাটার মধ্যে একটা মৃদু ইঙ্গিত আছে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব নিয়ে সে সময় আমি গোটা কয়েক প্রবন্ধ লিখেছিলাম, যা অনেকের উষ্মার কারণ হয়েছিল। কবিকে পড়তে দিয়েছিলাম সুবিচারের প্রত্যাশায়। পেয়েছিলামও তা। যাই হক, সেই থেকে কবি সময় সময় আমায় ফ্রয়েডের উল্লেখ করে ঠাট্টা করতেন।

কবির গান রচনা কালীন একটা ঘটনাও এখানে মনে আসছে। 'চিত্রাঙ্গদা' কিংবা 'চণ্ডালিকা' নাট্যের গান রচনা করছেন কবি—গেয়ে গেয়ে সুরেই রচনা করছেন এবং শৈলজারঞ্জন ও সঙ্গীত-ভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুলে নিচ্ছেন সেই সুর। ইতিমধ্যে একটি বৈষয়িক ব্যাপারে নিয়ে এসে পড়েছি—

ইতঃস্তত করছি, যাবো, কি যাবো না। কবি হঠাৎ গান থামিয়ে বললেন, 'বসো, উনি একটা কোন অভিসন্ধি নিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে।' সকলেই গীতালাপ থামিয়ে মৃদু স্বরে সুরু করলেন আলাপ-আলোচনা—এই নাটকের অভিনয়ে কোন ভূমিকায় কাকে নামানো যায়। একটা ভূমিকা-লিপি কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। কবি সকৌতুকে বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে—আমাদের অধ্যাপক মহাশয়কেই নামিয়ে দাও ওই ভূমিকায়।' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'গান টান আসে নাকি?' সবিনয়ে জানালাম আসে মনে, গলায় নয়। কবি হো হো করে হেসে উঠলেন। আর সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই সুরে গেয়ে উঠলেন এক কলি—সেই কলিটি, যেটি আমি আসার আগে গাওয়া হচ্ছিল। তাঁর এই সময়ের চেহারাটা ভুলবো না কোনদিন।

এতক্ষণ যে সাহিত্য-রচনার কথা বললাম, সে হল সকাল বেলার কথা। দুপুরে বা বিকেলেও তিনি কিছু কিছু লিখতেন—কোন পত্রিকা বা অনুষ্ঠানের তরফ থেকে বিশেষ কোন তাগিদ থাকলে। নইলে দুপুরে তিনি সাধারণত পড়তেন, নয়ত ছবি আঁকতেন। দিনে দুপুরে তিনি কোনদিন ঘুমুতেন না, সে ত আগেই বলেছি।

পত্রিকায় বচনা দেওয়া সম্বন্ধে তাঁর নীতির কথাও একটু বলি। ছোট-বড় ভালো-মন্দ কোন কাগজ লেখা চেয়ে তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হয়েছেন, এ আমার জানা নেই। যাদের কিছু দিতে পাবতেন না, তাঁদের অন্তত একখানা চিঠিও দিতেন, যা আত্মস্বতন্ত্র ভাবেই একটা সুন্দব বচনা। কিন্তু প্রার্থিত রচনাই দিতেন সাধাবণত—গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, যিনি যা চাইতেন। অনেবেব বিশ্বাস, খুব মোটা রকম পারিশ্রমিক নিতেন তিনি বচনার বিনিময়ে। কিন্তু সবিস্ময়ে দেখেছি, পনেবো আনা বচনাই তিনি দিতেন বিনা পাবিশ্রমিকে—যে এক আনাব জন্যে পারিশ্রমিক আসতো, তা-ও আসতো অপ্রার্থিত-ভাবেই। আমার উপস্থিতি কালে একটি সংবাদপত্রকে দেখেছি বেশ ভালো টাকা দিতে। কবি হেসে বলে-ছিলেন, 'গৃহাগত শস্য—স্বাগতম !'

নির্ব্বিচারে যে-কোন কাগজে বচনা দেওযা নিয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে আমাদের মতদ্বৈধ হয। বিশেষ করে একটি কাগজে—যে কাগজ ধারাবাহিক ভাবে তাঁর প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন অতি হীন প্রচার-কার্য্য চালিয়েছে। কবি বললেন, 'কি করি বলো? ওঁদেব হাতে যে অস্ত্র, সে ত আর আমি ধরতে পারি না।'

একটু থেমে বললেন, 'আমাদের মৃত্তিকা সাধারণ জিনিষ নয় হে—এখানে কমলানেবু পুঁতলে গোড়া নেবু হয়, সব রসের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে একটা দুষ্পাচ্য টক রস—উপায় কি? এঁরা মনে করেন, খুব তীব্র করে বললেই বুঝি খুব বড় সত্যি কথাটা বলা হয়—আর সেটাই এঁদের মতে আদর্শ সমালোচনা।' তারপর বললেন, 'এঁদের ক্ষমা করতে না পারলে আমি বেশী পীড়িত হই। কিন্তু মজা কি জানো? এঁরা ভাবেন, রবিবাবুর স্মৃতি-শক্তি বড় কম—কিছু তাঁর মনে থাকে না। মনে থাকে সবই, শুধু আঘাতের উত্তরে প্রতিঘাত দেবার প্রবৃত্তি নেই আমার—তাই চুপ করে থাকি।' এর পর আর তর্ক করিনি আমরা।

কবির পড়াশুনার পদ্ধতি ও বিষয় সম্বন্ধেও দু-কথা বলবো পরের অধ্যায়ে। যে সময়ের কথা বলছি, তখন তাঁর দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে—দুপুরের দীপ্ত আলোক ভিন্ন ছাপা অক্ষরও ভালো করে পড়তে পারেন না। কিন্তু ওরি ভেতর তিনি অজস্র বই পড়তেন এবং বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে তাঁর কোন পক্ষপাত ছিল না। রস-সাহিত্য ত বটেই, টেকনিক্যাল পর্য্যায়ের সব রকম বিষয় নিয়েও তিনি রীতিমতো আলোচনা করতেন।

— ৮ —

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ ঝোঁক দেখেছি বিজ্ঞান পড়ার ওপর। আইনষ্টাইন, মিলিকান, ম্যাক্সপ্ল্যাঙ্ক তিনি মোটামুটি পড়েছিলেন—জীনস, এডিংটন ত ভালো করেই পড়েছিলেন। শুধু পড়াই নয়, আপেক্ষিকতাবাদ, পরমাণুবাদ ইত্যাদির আশ্রয়ে নব্য পদার্থ-বিজ্ঞান যে একটি নূতন পরিণতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, তা সহজ করে দেশবাসীকে বোঝানোর জন্যে তিনি 'বিশ্ব পরিচয়' বইও লিখেছিলেন। একদিন বললেন, 'অব্যবসায়ীর উদ্যোগ—হয়ত রয়ে গেল অনেক ত্রুটি, তবু পথটা ত খুলে দিলাম। এবার অন্যেরা লিখুন।' বললাম, 'ব্যবসায়ীরা ত কেউ জনসাধারণ সম্বন্ধে মনে-মনে দয়া পোষণ করেন না—নইলে অমুক অমুক লিখতে পারতেন।' কবি হেসে বললেন, 'ওঁরা বিদ্যের জাহাজ, কিন্তু নোঙর করাই রইলেন।'

পরীক্ষা মূলক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও পড়াশুনা তিনি অনেক করেছিলেন—ফ্রয়েড, এডলার এবং য়ুং-এর লেখা দাগ দিয়ে দিয়ে পড়েছেন দেখেছি। মনোবিকলন তত্ত্ব নিয়ে কিছু লিখতেও উৎসুক হয়েছিলেন—শেষ পর্য্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। এখানকার অধ্যাপক বিনয়গোপাল রায়কে

ভাব দিয়েছিলেন বিষযটি হাল্কা কবে লিখতে, যেমন রথীন্দ্রনাথকে দিযেছিলেন জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখতে। রথীন্দ্রনাথের সুন্দব রচনাটি বই আকারে সম্প্রতি বেবিযেছে—বিনয বাযেব বইটি আমি ধাবাবাহিক ভাবে প্রকাশ কবেছিলাম 'যুগান্তবে', বই হয়ে বেরোয়নি এখনো।

জীবতত্ত্ব ববীন্দ্রনাথেবও একটি অতি প্রিয বিষয় ছিল। বংশানুক্রম ও জন্মান্তবীণ সংস্কাব নিয়ে একদিন আলোচনা হযেছিল—দেখেছি তাতে প্যাভলভের গ্রন্থি ক্ষবণতত্ত্ব বা ওয়াটসনেব আচাবতত্ত্ব সম্পর্কীয় বচনাবলীব সঙ্গেও কবিব অপরিচয় নেই। জুলিয়ান হাক্সলি, হলডেন প্রমুখেব রচনাবলী ত আমিই দেখেছি তাঁকে পড়তে। বলেছিলেন, 'ইচ্ছে করে এই সব বিষয় নিযে কিছু কিছু লিখতে। কিন্তু আমার আব সময নেই--তাই তাকিয়ে আছি তোমাদেব পাঁচজনেব দিকে।' দুঃখেব বিষয় আজো এসব লাইনে কলম ধবার লোক বাংলা দেশে কেউ দেখা দেননি

মার্ক্সবাদ ও রুশ-প্রসঙ্গে পড়াশুনা তাঁব একটু সীমা-বদ্ধ ছিল। লেনিন ও ট্রটস্কিব বচনা অল্পসল্প পড়তে দেখেছি। এছাড়া ল্যাস্কি, শ', আঁদ্রে জিদ, ইথেল

মেনিন, ওয়েব দম্পতী বা ওয়েলস-এব লেখাও পড়েছিলেন কিছু কিছু। কডেযেল ও র‍্যালপ ফক্স পৌঁছেছিলেন তাঁব হাতে, কিন্তু সম্যক অনুশীলনেব সময হয়নি বোধ হয়। মনে হযেছে, মার্ক্সীয় দর্শনের বস্তুমুখিতা, ধনসাম্যেব ভিত্তিতে নূতন বিশ্ব-বিধান গড়াব জন্যে মার্ক্সপন্থীদের বৈপ্লবিক মনোভাব বা কম্যুনিষ্ট বাষ্ট্রেব বাধ্যতামূলক সমানাধিকাবাত্মক সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মনে সুস্পষ্ট একটা নেতি ভাব ছিল। এই সব প্রসঙ্গেব আলোচনায় এলে তাই তিনি সাধাবণত একটু উত্তেজিত হতেন।

বিতর্ক সাপেক্ষ হলেও খুব সুন্দব একটা কথা বলেছিলেন একদিন—'ভাবতবর্ষের জীবন ও সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ধাবা আছে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে বাশিয়াব ছকে গড়ে তুলতে চাও তোমবা—আপত্তি করবো না, জিনিষটা গড়ে উঠলেই ভালো। কিন্তু কেবল মাত্র ধন-বন্টনের সাম্যে বা ভোগ-উপভোগের সীমানা সর্ব্বমানবের মধ্যে পূর্ণভাবে অবাবিত করে দেওয়াতেই মানুষেব চবম মুক্তি, এ কথা আমি মানতে পারি না। মানুষেব আত্মাকে জেনেছি বস্তু-নিরপেক্ষ বলে—তার মুক্তি এতে 'নয়। সে কথা ভুলেছি বলেই মানুষের মুক্তি

খুঁজতে বেরিয়েছি আমরা হানাহানির পথে!' বলা বাহুল্য এ মৌলিক বিরোধের কথা। মার্ক্সীয় যুক্তি-ধারার অবতারণা এখানে তাই নিস্ফল!

আধুনিক তত্ত্ববিদ্যার প্রধান তিনটি দিক সম্বন্ধে তাঁর পড়াশুনার কথা বললাম। কিন্তু এর বাইরেও তিনি পড়াশুনা করতেন প্রচুর। জিও-পলিটিক্স, রসশাস্ত্র থেকে সুরু করে, খাদ্যতত্ত্ব, হোমিওপ্যাথি, পশু-পালন পর্য্যন্ত নানা বিষয়েরই বই দেখেছি তাঁর টেবিলে—সারা দুপুর নিবিষ্ট মনে পড়তেন এটা-ওটা। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন ক্ল্যাসিক্স · এ সব ত পড়তেনই। নিছক সাহিত্যের রাজ্যের খবরাখবরও তিনি যে-কোন আধুনিক সাহিত্যিকের চেয়ে কম রাখতেন না—জেমস জয়েসের 'ইউলিসিজ' আগাগোড়া পড়েছিলেন—এলিয়ট-পাউণ্ডের কবিতা নিয়ে ত প্রবন্ধই লিখেছিলেন। লরেন্সের এবং হাক্সলির রচনা সব পড়েন নি, তবে ওঁদের সম্বন্ধে অন্তরে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কাম্মিংস-এর লেখা তাঁর হাতে এনে দিয়েছিলাম আমি—ধৈর্য্য ধরে সমস্তটা পড়তে পারেন নি, তবে কৌতুক করেছিলেন খুব। বাংলাদেশের তথাকথিত আধুনিক কবিদের একজনকে বইটি পাঠিয়ে দেব বলায়, কবি বলেছিলেন, 'বেশ বললে! উনি যে

এঁকে আদর্শ করেই নীরবে একলব্যত্ব করে চলেছেন, তা বুঝি জানো না?' কথা-প্রসঙ্গে বুঝেছি, টলষ্টয়, এনাটোল ফ্রাঁস, মেটারলিঙ্ক, ইবসেন, গোর্কি, জোহান বোয়ার, চেকভ তাঁর ভালো করে পড়া ছিল—বলাঁর উপন্যাস পড়েছিলেন, আলোচনা সাহিত্য পড়েন নি। ফরাসী সিম্বলিষ্টদের বা নব্য রুশদের লেখা তাঁর বিশেষ ভালো লাগতো বলে মনে হয়নি।

আমি শুধু ইউরোপীয় সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কীয় পড়াশুনার কথাই বললাম। প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলন সম্বন্ধে ত আর কিছু বলার নেই। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং রস-সাহিত্য ত বটেই, টেকনিক্যাল পর্বেরও এমন খুব কম জিনিষ ছিল, যা তিনি চর্চ্চা না করেছিলেন—ভাস্কর্য্য, শিল্পকলা, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, এমন কি রাষ্ট্র-শাসন প্রণালী পর্য্যন্ত। [রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্র-শাসন সম্পর্কীয় একখানি বই থেকে তিনি বের করেছিলেন একটি কথা—'ঔপায়িক' (সেকালের রাজকীয় উপদেষ্টা বোধ হয়)—এই পদটি তিনি রঙ্গচ্ছলে অর্পণ করেছিলেন সুধাকান্ত বাবুকে।] শেষ জীবনে মহাভারতের সমাজ ও জীবন ব্যাখ্যা করে একখানা বই লিখবেন ঠিক করেছিলেন—কিন্তু সে আর হয়নি। 'মহাভারতের মহাভার

আঁকতে কোনদিন দেখিনি। ববাববই টেবিলের ওপর ড্রইং-এর কাগজ ফেলে তুলি ও কলম (বেশীর ভাগই কলম) দিয়ে তিনি ছবি আঁকতেন। দেখেছি রঙেব ভেতব আঙুল ডুবিযে সেই আঙুল দিযেও কাগজে পোঁচ বুলাতে। আর বংও সব সময় তৈবি বং থেকে নিতেন না—নিজের মাথা থেকে ভেবে ভেবে বাব করতেন নানা বকম কম্পাউণ্ড—গাছেব পাতা, বীবভূমেব গেরুয়া মাটি, ভুষো কালি—হবেক বকম জিনিষই ব্যবহাব হত তাঁব ছবিতে।

আঁকাব ব্যাপাবে তিনি বাস্তব থেকে অনেক সময় মডেল নিতে চেষ্টা কবতেন—কিন্তু তাঁব ছবি কোন দিনই আশ্রিত বাস্তবেব প্রতিরূপ হত না। ঘষতে ঘষতে এক একটা ছবি দৈবাৎ এক এক বকম হযে দাঁড়াতো—অনেক সময কোন চেনা জিনিষও হত না। হো হো কবে হেসে উঠতেন কবি। একদিন বললেন, ‘ছবিতে I have no reputation to lose—কিন্তু এই যদি এবহত, তাহলেই তোমাবা উঠে পড়ে লাগতে এব একটা কোন অর্থ বেব করতে’। চুপ কবে থাকতে দেখে বললেন, ‘একজন নবোযেজিযান আমাব ‘সে’ বইটিব ছবিগুলো দেখে তাজ্জব হযে গেছে। সে বললে, আমাদেব দেশে হলে তুমি

সাহিত্যিকেব চেয়ে শিল্পী বলেই বেশী আদৃত হতে'। একদিন ছবি আঁকছেন—একটি মেয়ের মতো দেখাচ্ছে জিনিষটা—বললেন, 'বলো ত কি হয়েছে এটা?' বললাম একটি মেয়ে ত। কবি বললেন, 'তবু ভালো যে বলো নি একটা ছাতা। আসলে ওটি একটি উৎস'—বলেই উচ্চ হাস্য। এ বিপদ প্রায়ই হত তাঁব ছবি নিয়ে।

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

—১—

রবীন্দ্রনাথ একটা জায়গায় বেশী দিন স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না, কারণে-অকারণে দেখেছি তাঁকে বাসা বদল করতে। শ্যামলীতে রয়েছেন—লেখাপড়া নিয়ে বেশ মেতে আছেন, হঠাৎ কি মনে হল, বললেন, 'ডেরাডাণ্ডা গোটাও—সব নিয়ে যাও পুনশ্চতে।' সঙ্গে সঙ্গে জিনিষপত্র রওনা হয়ে গেল। কবি এসে নূতন বাসায় বসলেন। বললেন, 'এখানে একটু হাত-পা গুটিয়ে বসতে পারবো দিন কতক—বেশ গোছানো জায়গাটা।' কিন্তু সপ্তাহ অতিক্রান্ত হবার আগেই আবার মত বদলালো। বললেন, 'ভালো লাগছে না এখানে। এত অপরিসর যে মন একেবারে মুষড়ে পড়ে।' আবার মোট-ঘাট ওঠানো হল হয় শ্যামলীতে, নয়ত উদয়নের সংলগ্ন বাগানের ছোট ঘরটিতে। ক্রমাগত এই ভাবে একটা বাসা থেকে আর একটা বাসায় আনাগোনা চলতো তাঁর। এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল জিনিষটা ওখানে সকলের যে এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করতেন না—অপ্রতিবাদেই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করে যেতেন।

কবির এই বাসা-বদলের অভ্যাস এত প্রবল ছিল যে এর সঙ্গে তাল রাখার প্রয়োজনে উত্তরায়ণ

কম্পাউণ্ডেব ভেতব অনেক ক-টি বাড়ী তৈবী কবাতে হয়েছে, যাব প্রত্যেকটিতেই কবি কিছুদিন কবে বাস কবেছেন। প্রথম থাকতেন উদয়নে, খেয়াল হল একটা নিবিবিলি মাটির ঘবে থাকবেন—সঙ্গে সঙ্গে তৈবী হল শ্যামলী, মাটিব কংক্রিটে বানানো চমৎকাব ঘব। কবি বললেন, 'হাঁ, এই ঠিক ঘব আমাব। মাটিব সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পাবি না আমি—আমি যে মাটিব খুব কাছাকাছি। এখানেই বাকী ক-টা দিন কাটবে আবামে।' কবিতাব বই লিখলেন তাব নাম দিলেন 'শ্যামলী'। তাব পবেই শ্যামলী আব ভালো লাগলো না—প্রথমত ছাদেব ছু-এক জাযগায ফাটল ধবলো, তা দিয়ে জল চুঁইযে পডতে লাগলো, দ্বিতীযত এমনিই কবিব সোহাগ কমে গেল তা থেকে—তৈবী হল পুনশ্চ। কিছুদিন কাটলো এখানে—কবিতাব বইয়েব নামকবণ কবে একেও তিনি সম্মানিত কবলেন। কিন্তু না—গ্রীষ্মে ঘরটা বড্ড তেতে ওঠে—একেবাবে জ্বলন্ত কটাহেব মতো ঠেকতে থাকে। বাতাবাতি চলে গেলেন উদয়নের বাগান-ঘবে। পুনশ্চেব লম্বালম্বি আব একটা বাডীও বানানো হযেছিল আমি চলে আসার পব। সেখানেও কিছুদিন 'ছিলেন। শেষ রোগ শয্যায় যখন, তখন গিয়ে

দেখলাম, বসেছেন উদয়নের একতলার হল ঘরটিতে—তাতে air-condition করা হয়েছে। শান্তিনিকেতনে এই তাঁর সর্ব্বশেষ বাস-গৃহ।

তাঁর বাসা-বদলের এই অবিরাম অভ্যাস আমার খুব কৌতুকাবহ মনে হত। কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম এর কারণ। কবি বললেন, 'এক জায়গায় স্থাণু হয়ে থাকার মধ্যে আছে একটা বৈচিত্র্যহীন স্থিতিশীলতা, যা মৃত্যুর নামান্তর। বার বার আবেষ্টনী বদল করার দ্বারা নিজেকে বার বার নূতন করে পাই—কোন ব্যাপারেই তাই আমার অভ্যস্ততা আসে না।'

যিনি সৃষ্টির রাজ্যে নিত্য নূতন, তাঁর পক্ষে নিজেকে নূতন করে বার বার উপলব্ধি করবার প্রয়োজন ছিল বৈকি! আহারে-বিহারে, চালে-চলনে, সর্ব্ববিষয়েই তিনি নূতন নূতন পরীক্ষার সুযোগ নিতেন। বাসা-বদল তারি একটা বৃহৎ আনুষঙ্গিক—বাইরে থেকে এ যতই কৌতুকাবহ হক না কেন!

শুধু বাসা-বদল নয়, থেকে থেকে স্থান-বদলের ঝোঁকও তাঁর প্রবল হয়ে দেখা দিত। সত্তর বৎসরের পর তিনি আর বড় কোন ট্যুরে বের হন নি—শরীরের ক্রম-বর্দ্ধমান শ্লথতাই তার কারণ—তবু তিনি ইতস্তত

ঘুরে বেড়াবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠতেন। একটা ঘটনা মনে পড়েছে এখানে। গ্রীষ্মের ছুটির অল্প আগে শান্তিনিকেতনের ভ্রাম্যমাণ নাটুকে দল বেরুলো একটি আভিনয়িক সফরে—কবি সঙ্গে যাবার জন্যে ব্যস্ত হলেন। কিন্তু চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বললেন, তাঁর পক্ষে বিশ্রাম নেওয়াই সমীচীন—কারণ তার কয়েক মাস আগেই তাঁর ওপর দিয়ে গেছে অত বড় বিসর্প রোগের আক্রমণ। কবি বিমর্ষ হলেন খুবই, কিন্তু তবু ধৈর্য্য ধরে শান্তিনিকেতনেই রইলেন।

নাটুকে দল এলো প্রথমে কলকাতায়, স্থির হল সেখান থেকে পূর্ব্ববঙ্গে রওনা হবে। প্রতিদিনকার খবর পৌঁছুতে লাগলো তাঁর কাছে—শেষটা আর পারলেন না কবি, তিন-চার দিন পরে হঠাৎ এক দুপুরে তিনি সেজে-গুজে তৈরী হয়ে বললেন, 'গাড়ী আনো, আমি কলকাতায় যাবো।' জামা-কাপড় স্যুটকেশ ইত্যাদি গুছিয়ে ভৃত্য বনমালীও পিছু পিছু তৈরী হল। সুধাকান্ত বাবু তাঁকে নিয়ে যাত্রা করলেন। পূর্ব্ববঙ্গে যাবার জন্যেও তিনি জেদ ধরেছিলেন, কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি—জোর করেই তাঁকে কলকাতা থেকে মংপু পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রচণ্ড শীতে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-উৎসবে

যাওযার সময়ও ঠিক এই রকম তিনি কারুর আপত্তি কানে তোলেন নি।

নিজের এই ভ্রাম্যমান প্রকৃতিটা তিনি বুঝেছিলেন ভালো করেই। বলতেন, 'উড়ে উড়ে বেড়ানোর ধাত আমার, জুড়ে বসতে পারলাম না কোন দিনই। জীবন-বিধাতাও তাই আমায় সংসারের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন—কোথাও রাখেন নি কোন পিছু-টান!' পিছু-টান তাঁরো ছিল, যেমন আর পাঁচজন বৃদ্ধের থাকে —কিন্তু নিজের মননশীলতা দিয়ে তিনি সেই গৃহ-জীবনের সীমানা অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন বলেই এমন ভাবে দিকে দিকে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করে দিতে পেরে-ছিলেন। চলার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা এসে পড়লেই তিনি ক্লিষ্ট হতেন। শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি দ্রুত অপচিত হচ্ছিল, শুনতেনও একটু কম, সব চেয়ে বেশী যা হয়েছিল, চলৎশক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল—স্বভাবতই বহির্মুখিতার অভ্যাস নিয়ন্ত্রিত করে আনতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু মনে তাঁর প্রচণ্ড গতি ছিল শেষ দিন পর্য্যন্ত, সেই গতির বেগেই মাঝে মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠতেন তিনি বাইরে বেরুবার জন্যে। একদিন দেখলাম ভয়ঙ্কর উত্তেজিত —বলছেন, 'কেন এই বাধা? কেন এই অসামর্থ্য?

মানুষকে যিনি শক্তি দেন, কেন তিনি আবার কেড়ে নেন সে শক্তি?' দক্ষিণ ভাবতে একটা সাংস্কৃতিক সফবে বেরুনোব পবিকল্পনা ছিল, যাতে অনেকেই আপত্তি কবে-ছিলেন তাঁব শবীবেব দিকে লক্ষ্য বেখে। তাতেই এই অস্থিবতা!

শান্ত মুহূর্তে সময সময় তিনি বলতেন তাঁব ভ্রাম্যমান জীবনেব নানা অভিজ্ঞতাব গল্প। পৃথিবীব বিশিষ্ট সভ্য-দেশেব প্রায সবগুলিতেই তিনি গেছেন, দেখেছেন সে-সব জায়গাব দর্শনীয় জিনিষ যা-কিছু—গুণী-জ্ঞানী মনস্বীদেব সংস্রবেও এসেছেন প্রচুব। সেই সমস্ত অমূল্য অভিজ্ঞতাব কাহিনী লিখে রাখি নি, দুঃখ হয সময় সময কোন দিনই তা লেখা হবে না ভেবে। দুঃখ তাঁবও ছিল। একদিন বলেছিলেন, 'দুনিয়াব ঘাটে ঘাটে নৌকো নিযে ফিবেছি—ফেবী করে এসেছি নিজের পণ্য, প্রতিদানে পেযেছিও অনেক। কিন্তু তাব সামান্যই জানতে পেবেছে আমাব দেশের লোক। যাবা কোন-না-কোন সময সঙ্গী হযেছে আমার—দেখে এসেছে তারা, কিন্তু কেউ তাব কাহিনী ব্যক্ত কবলো না দেশেব সাম্নে'। বলেছিলাম তাতে, 'কিছু কিছু আপনিই দিযে যান!' হেসে উত্তব দিয়েছিলেন কবি, 'আত্ম-প্রকাশের মূল্য আছে, কিন্তু আত্ম-

প্রচারকে আমি ঘোরতর অপছন্দ করি। অথচ এ কাহিনীর অল্প কিছু বললেও তা আত্ম-প্রচারের কোঠায় গিয়ে পড়বে।' কয়েক জনের নাম বলছিলেন এই প্রসঙ্গে (যেরা রবীন্দ্র-ভক্ত রূপে নাম আছে তাঁদের), যাঁদের কাছে কবি প্রত্যাশা করতেন তাঁর বিশ্ব-ভ্রমণের একটি ইতিহাস। দুঃখের বিষয় তাঁরা সে প্রত্যাশা পূর্ণ করেন নি তাঁর।

শেষ জীবনে তাঁর সাধ ছিল আর একবার বেরুবেন। একজন বিদেশী ভ্রমণকারীর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন একদিন—If I could shake off this infirmity of age, I would most surely go to your country again and see if I am still remembered there। সে আশা আর সফল হয়নি তাঁর—শরীর তাঁর উত্তরোত্তর অপটু হয়ে পড়েছে, বাইরেও বেধে গেছে যুদ্ধ। এক দিন তাই বললেন রঙ্গ করে, 'আর হল না হে। Better luck next time!' সে কথা যখনই মনে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তাঁর সেই কৌতুক-বেদনায় মেশানো অদ্ভুত মুখচ্ছবি!.

— ১০ —

মুখ থাকলেই কথা বলা যায় বলে বাংলাদেশে কথা বলা জিনিষটাকে কেউ শেখার দরকার মনে করেন না। অনেক বিশিষ্ট লোকেরও তাই দেখেছি, কথা বলার ব্যাপারে অণুমাত্র দক্ষতা নেই। যেমন-তেমন করে কতকগুলো শব্দ উদ্‌গার করে এবং যেখানে ভাষায় কুলোয় না, সেখানে বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্য নিয়ে, এদেশে মনোভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে কথা বলা ছিল একটা আর্ট—ফেলে ছড়ে যে-সব কথা তিনি বলতেন, মনে হত, লেখার ভেতরও ও-রকম সুষ্ঠু বাক-বিন্যাস করতে পারলে অনেকে ধন্য হতেন। বকুল গাছ যেমন অজস্র ফুল বৃষ্টি করে, তবু আগাগোড়া তার ফুলে ছাওয়া থাকে—এ যেন ঠিক সেই রকম! তাঁর ছন্দায়িত কণ্ঠস্বর নিতান্ত আটপৌরে কথাতেও অদ্ভুত একটি মাধুর্য্য সঞ্চার করতো, তারপর ছোট বড় সব কথাতেই তিনি প্রয়োগ করতেন সুনির্ব্বাচিত শব্দমালা। অভ্যাস-মলিন ঘরোয়া প্রতিশব্দ বা খেলো জাতের শ্ল্যাং তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হতে শুনিনি বললেই চলে। তাঁর ভাষা ছিল আগাগোড়া সাহিত্যিক ভাষা কি শব্দ-সম্পদে, কি বাক-ভঙ্গিমায়, আর কি ব্যঞ্জনায়! এই ভাষায় যে কি করে প্রাত্যহিক

জীবনের সব কিছু চাহিদা মেটাতেন তিনি, ভেবে সময় সময় আমার অবাক লাগতো।

একটা সাধারণ ঘটনা—আশ্রমের ছেলে-মেয়েরা একদিন ধরেছে তাঁকে, একটা গান গেয়ে শোনাতে হবে তাদের। হেসে বললেন কবি, 'কোথায় ছিলে সেদিন তোমরা, যেদিন কণ্ঠ ছিল? দস্তাপহারক আমার সে কণ্ঠ কেড়ে নিয়েছেন।' তখন ধরলে তারা, একটা আবৃত্তি করুন। নিমরাজী হলেন, হয়ে বললেন, 'আমার বাক-যন্ত্রকে কি তোমরা ছুটি দেবে না? সামর্থ্যের অতিরিক্ত খাটিয়েছি তাকে, আর বেশী পীড়ন যদি করি, তাহলে কিন্তু ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা আছে জেনো!' বলাই বাহুল্য আবৃত্তি করলেন তারপর এবং অপূর্ব্ব সে আবৃত্তি—'মাঘের সূর্য্য উত্তরায়ণ পার হয়ে এলো যবে।'

তাঁর কথা বলার রীতিই ছিল এই। কখনো কখনো আরো বেশী অলঙ্কৃত হয়ে উঠতো তাঁর বাক্যলাপ এবং শুধু যে ভারী বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তার সময়ই সেটা হত তা নয়—অতি সাধারণ কথাতেও দেখেছি তাঁর, এসে পড়তো এমন এক-একটা শব্দ বা উপমা, যা দুর্লভ মূহূর্ত্তে উচ্চারিত হওয়ার মতো। একদিন কথা হচ্ছিল বীরভূমের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। কবি বললেন,

'গোটা বাংলা দেশটাই মানুষ হযেছে নদীব কোলে—তাই তাব শ্যামলিমাব ঐশ্বর্য্য এত বেশী। শুধু বাঢেব এই অঞ্চল গুলো (মানে বাঁকুডা, বীবভূম ইত্যাদি) কেমন করে যেন মায়েব স্নেহ-ধাবা থেকে বিচ্ছিন্ন হযে পড়েছে—একটা রুক্ষ ছন্নছাড়া বৈবাগীব চেহাবা এদেব ! তাইতেই বাবা মশায় এই জাযগাটিকে তাঁব একক তপশ্চর্য্যাব অনুকূল মনে কবেছিলেন।' বাগাত্মিকা ভাবেব নিকেতন দক্ষিণ বাঢ়, আব তান্ত্রিকতাব জন্মভূমি উত্তব বাঢ়, ভৌগোলিক সংস্থিতিব পার্থক্যই তাব আদি কারণ—কথাটা পুবানো, আমবাও বলে থাকি, কিন্তু এমন কবে বলতে পাবি কি ? এমন সাধু ও সাহিত্যিক ভাষায় ?

এই সাধু ভাষা তাঁব আবো জমজমাট হত কৌতুক কবার সময। কৌতুক তিনি কবতেন সকলেব সঙ্গেই। পুত্র, পুত্রবধু, বন্ধু, সেবক, ভৃত্য—পাত্রভেদ ছিল না তাঁর এ বিষয়ে। ভৃত্য বনমালীকে একদিন ফবমাযেস কবেছেন চট কবে চা আনতে, কিন্তু চা আনতে দেবী হচ্ছে—বিবক্ত হযে বললেন কবি, 'চা-কব বটে, কিন্তু সু-কব নয়।' ইতিমধ্যে বনমালী এসে হাজিব—মুখে সেই সুপবিচিত আহাম্মকেব হাসি। কবি কৃত্রিম ক্রোধে বললেন তাঁকে, 'তুই বোধ হয় জানিস না যে তোর

আর বইতে পারলাম না হে' বলে একদিন একখানি পাৎলা খাতা দিলেন—দেখলাম তাতে লিখেছেন ভূমিকা মতো একটা জিনিষ—ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে। এমন একটা জিনিষ শেষ হল না!

আগেই বলেছি, পড়াশুনা কবি করতেন সাধারণত দুপুর বেলা। সমস্ত শান্তিনিকেতন তখন স্তব্ধ—আহারান্তে কর্ম্মীরা বিশ্রাম করছেন, ছাত্র-ছাত্রীরা হয় বিশ্রাম করছে, নয় নিঃশব্দে আপন আপন ঘরে বসে বিদ্যালয়ের পড়া তৈরী করছে—আর কবি তাঁর ঘরে খোলা জানলার ধারে একখানি খাড়া কাঠের চেয়ারে বসে কখনো পড়ছেন, কখনো বা ছবি আঁকছেন। কোন কোন দিন লিখতেও দেখেছি। নিরলস কর্ম্ম-শক্তির এই দৃষ্টান্তে অবাক হতাম। দিবানিদ্রা বা বৃথা সময়াপেক্ষ অতিশয় অপছন্দ করেও বীরভূমের দুর্দ্ধর্ষ শীত-গ্রীষ্মে নিজেকে তেমন করে কায়দায় আনতে পারিনি কোন দিনই। বহু সময় অযথা নষ্ট করেছি, হয় ঘুমিয়ে, নয় ইতস্তত ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হত বৃদ্ধ কবির কর্ম্মনিষ্ঠা, আর নিজের কাছেই লজ্জা পেতাম।

রবীন্দ্রনাথের পড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে দু-একটা কথা এখানে বলি—অনেক বিষয় তিনি আনুপূর্ব্বিক না পড়ে

শুধু পাতা উল্টে যেতেন এবং নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়েই ফাঁক পূরণ করে নিতেন। যে সমস্ত বিষয় পূর্ণভাবে পড়তেন, তা-ও তিনি পড়তেন অতিশয় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, কিন্তু ওরি ভেতর সমস্ত দিক তাঁর নজরে ধরা পড়তো। আলোচনা উঠলেই টপাটপ হাতে-কলমে প্রসঙ্গ ও অনুচ্ছেদ তুলে ধরতেন।

তাঁর পড়া বই যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই দেখেছেন কত মূল্যবান নোট তিনি লিখে যেতেন ইতস্তত। একখানা দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে তিনি এমন কতকগুলো মন্তব্য লিখেছিলেন, যা থেকে অনায়াসেই আর একখানা থিসিস লেখা যেতো। তাঁকে দেখিয়েছিলাম—বললেন, 'ছড়িয়ে গেছি হে, যে পারবে কুড়িয়ে নেবে'। বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত, কবির অধীত বইগুলো থেকে এই সমস্ত মত ও মন্তব্য আহরণ করা। কোনারকের লাইব্রেরী ও বিদ্যাভবনের লাইব্রেরী দু-জায়গাতেই জমা হয়েছে এই বইগুলো।

আগেই বলেছি দুপুরে পড়ার সঙ্গেই কবির ছবি আঁকা চলতো। ছবি আঁকার ব্যাপারে তিনি শিল্পীদের রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করতেন না এক ফোঁটাও। ইজেলে ক্যানভাস্ খাড়া করে, তুলি ও প্যালেট হাতে দাঁড়িয়ে

অতুলনীয় অকর্ম্মণ্যতায় আমি খুব বেশী পুলকিত হইনি ?' বনমালী বুঝলো এটা রসিকতা, কারণ এ জিনিষ ছিল ওখানকার সকলেরই সুপরিচিত।

কবির কথা বলার সব চেয়ে বড় উপভোগ্য অংশই ছিল তাঁর এই রসিকতা। কথার পিঠে লাগসই কথা বলে বা সমধর্ম্মী শব্দ বসিয়ে রসসৃষ্টি করা তাঁর কাছে যেন স্বভাবসিদ্ধ ছিল। একটা পত্রিকার কথা হচ্ছিল—কবি বললেন, 'একদা সম্পাদক ছিলাম আমি এই পত্রের।' কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমুক কি এই পত্রের সহ-সম্পাদক ছিলেন ?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন কবি, 'সহ কি দুঃসহ বলতে পারি না, তবে ছিলেন মনে হচ্ছে।' সুধাকান্ত বাবুর টাকটা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে—কবি বললেন, 'তোর শিরোদেশ যে ক্রমেই মেঘমুক্ত দিগন্তের আকার ধরছে রে।' সবিনয়ে বললেন ভদ্রলোক, 'আমার বাবারও ঐ রকম হয়েছিল শেষ জীবনে।' হো হো করে হেসে জবাব দিলেন কবি, 'তাইতেই বুঝি শিরোধার্য্য করেছিস ওটা ?'

তাঁর পত্রাবলী থেকে নির্ব্বাচন করে একটা সঙ্কলন ছাপানোর আয়োজন চলছিল। সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল বর্ত্তমানের লেখকের হাতে—একটি পত্রে সমসাময়িক

কালের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা অনুচ্ছেদ ছিল, যা কবির জীবনকালে ছাপানো অসঙ্গত হত। জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাদ দোব কি এটুকু?' 'নিশ্চয় নিশ্চয়' বললেন কবি, 'বাদ দাও, নইলেই বিবাদ হবে।' মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁর মুখ দিয়ে বেরুতো এই ধরণের কথা। দুঃখ হয়—এসব কথা বেশী লিখে রাখিনি।

আর একটা লক্ষ্য করার জিনিষ ছিল তাঁর কথা বলায়—ইংরেজী শব্দ তিনি যথাশক্তি বর্জ্জন করে চলতেন। ইংরেজী বুকনির ফোড়ন দিয়ে যে ককনি বাংলা বলা এ-কালের শিক্ষিত সমাজে চল হয়েছে, কবি ছিলেন তার ঘোর বিরোধী। যাবতীয় নিত্য ব্যবহার্য্য ইংরেজী কথারই তিনি বাংলা প্রতিশব্দ বলে যেতেন এবং অত্যন্ত সহজে বলে যেতেন। কি করে যে আসতো কথাগুলো ভেবেই পাইনি কোন দিন। দু-একটা জায়গায় থেমে দাঁড়ালেই মনে হত, বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে সেগুলো তাঁর দানরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য। ফাউণ্টেন পেনের বাংলা 'ঝর্ণা কলম' হয়ত খুব ভালো হয় নি, কিন্তু থার্ম্মোমিটারের বাংলা 'জ্বর কাঠি' বা Children Cyclopaediaর বাংলা 'শিশু ভারতী' নিশ্চয় চমৎকার হয়েছে। কলকাতার রাস্তাগুলি বাংলা নামে রূপান্তরিত

করার কথা উঠেছিল—পটাপট বলে গেলেন, 'এসপ্লানেড' —বলতে পারো 'গড়চত্বর', 'রাসবিহারী এভেন্যু'—'রাসবিহারী বীথি'। অদ্ভুত একটা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

পূর্ব্ববঙ্গের মুখ দিয়ে চন্দ্রবিন্দু বের হয় না, পশ্চিম বঙ্গ আবার অনাবশ্যক ভাবে ওটা প্রয়োগ করে থাকেন—ওঁরা বলেন, চাদ, পাচ, তাবু—এঁরা আবার বলেন, হাঁসপাতাল, ঘোঁড়া, হাঁসি—এই নিয়ে চলছিল একটা উতোর কাটাকাটি। কবি নীরব শ্রোতা—মাঝে মাঝে এক-আধটু টিপ্পনী করছেন। বললেন, 'শোনো নি, খোঁকার বাবা বাঁসায় ছিলেন, হঠাৎ সাঁপ বেরুলো একটা?' আহত পশ্চিম বঙ্গের একজন বললেন, 'আপনিও ত অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু দেন, যেমন অলস বলতে আপনি লেখেন কুঁড়ে।' আপাত-গাম্ভীর্য্যে মুখ ভারী করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ওতে অপরাধটা কি হয়েছে?' বলা হল—কুড়ে শব্দের আদি-অর্থ কুড় বা কুষ্ঠগ্রস্ত, অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য! সঙ্গে সঙ্গে কবি বলে উঠলেন, 'কেন? কুণ্ঠিত অর্থাৎ শ্রমকুণ্ঠিত থেকে কুঁড়ে হলে তোমাদের আপত্তি কোথায়?' বানিয়ে বললেন বটে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের মুখ চুপ হয়ে গেল ওতেই।

কবির কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে একটা কথা অবশ্য মনে হয়েছে আমাব সময় সময়—তাঁব শব্দ-যোজনা এবং ষ্টাইল দুটোই ছিল তৈরী-কবে-নেওযা। খাঁটি বাংলা বাক-ভঙ্গী, তার phrase-idiom বা প্রাত্যহিক প্রতিশব্দ তিনি যথাসম্ভব অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এবং গিয়েছিলেন জোর কবে নয়, মনেব স্বধর্ম্ম অনুসাবেই। হয়ত তথাকথিত বাঙালিযানাব বিরুদ্ধে তখনকাব ব্রাহ্ম-সমাজ যে সাংস্কৃতিক অভিযান চালিয়েছিলেন, তারও কিছুটা প্রভাব ছিল এব পেছনে।

অশিষ্ট শব্দ সম্বন্ধে তাঁব মস্ত একটা শুচিবায ছিল—কতকগুলো আমাদেব মতে শিষ্ট শব্দ পর্য্যন্ত তাঁব ববদাস্ত হত না। মনে আছে ‘গোলমাল’, ‘ধাপ্পাবাজ’ এম্নি কয়েকটা কথা বদলে, তিনি ‘কোলাহল’, ‘প্রতাবক’ ইত্যাদি সাধু প্রতিশব্দ বসিয়ে দিয়েছিলেন সাধাবণ একটা রচনায। খাস বাংলা গালাগালি বা রসিকতা ত তাঁর মুখ দিযে বাব হওযাই অভাব্য ছিল। খুব বেশী বলতে শুনেছি তাঁকে—‘মন্দ লোক হলে এ অবস্থায তালব্য শ’য়ে আকার দিয়ে বলতো।’ এই পর্য্যন্ত!

রবীন্দ্রনাথের বাক-ভঙ্গীব এই অতি-পরিচ্ছন্নতা তাঁব অন্তর-প্রকৃতিরও দর্পণ স্বরূপ বলা যেতে পারে। আপাত-

দৃষ্টিতে যা অশুচি, অশিষ্ট বা কুদৃশ্য, তাকে তিনি কি জীবনে আর কি বাচনে, সর্ব্বত্র এড়িয়ে চলতেন। কাজেই তাঁর কথন-রীতিকে অনুসরণ করলে তাঁর মনন-রীতি পর্য্যন্ত যাওয়া যায়—এই আমার বিশ্বাস। বলতে পারেন, জিনিষটা অকৃত্রিম নয়—কিন্তু কবির কথাতেই তার উত্তর দোব—'শিল্প বস্তুটাই অকৃত্রিম নয়—বাক্য তারি একটা আনুষঙ্গিক, ওটা আর অকৃত্রিম হবে কি করে?' এবং কবির ক্ষেত্রে কথা-বলা যে আগাগোড়াই একটা আর্ট ছিল, এ ত আগেই বলেছি।

— ১১ —

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'বিধাতা আমায় স্পর্শকাতর করেছেন। আঘাত আমি পাই—কিন্তু ফিরিয়ে আঘাত দিতে পারি না।' এ-কথা যে কত সত্যি, তা তাঁর সামাজিক ব্যবহারের ধারা লক্ষ্য করলেই বোঝা যেতো। কোন অবস্থাতেই কারুর সম্পর্কে রূঢ়তা বা ঔদাসীন্য দেখানো তাঁর দ্বারা সম্ভব হত না। যে সমস্ত লোক সামনে তাঁকে ভক্তি দেখাতেন, আড়ালে নানা ভাবে তাঁর কুৎসা কীর্ত্তন করতেন, তাঁদের তিনি চিনতেন না এমন নয়। কিন্তু তাঁরাই আবার যখন প্রসাদভিক্ষু হয়ে তাঁর দ্বারস্থ হতেন, কবি তাঁদের অভিলাষ পূরণে কুণ্ঠিত হতেন না। বিরক্তি বা ক্ষোভের ক্ষীণতম আভাষও প্রকাশ পেতো না তাঁর কথাবার্ত্তায় বা ব্যবহারে।

একদিন এই শ্রেণীর কোন ভদ্রলোককে একটি কবিতা প্রকাশের জন্যে দেওয়ায় আমরা ক্ষুণ্ণ হই এবং তা নিয়ে অনুযোগ করি। কবি তাতে বললেন, 'দেখো, আমি নিজেও জানি যে বাজারে রটবে, রবিবাবু ভয়ের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ওঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছেন—আর সে-কথা বড় গলা করে বলবেন হয়ত উনিই। তবু আমারপক্ষে ত ওঁর স্তরে নেমে আসা সম্ভব নয়। প্রার্থীকে

বিমুখ করা যায় কি করে?' আসলে মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান করা বা অশিষ্ট জনকে ঘা দিয়ে সজাগ করে দেওয়ার মতো প্রকৃতিই তাঁর ছিল না।

তাঁর এই সৌজন্যের অপচয় হত পদে-পদেই। যে-কোন লোক তাঁর সহজলভ্যতার সুযোগে তাঁকে দিয়ে আপন আপন কার্য্যোদ্ধার করিয়ে নিতেন। এই সব কাজের ফলে সময় সময় তাঁকে অযথা অখ্যাতি ভোগ করতে হয়েছে বড় কম নয়। সে সময়কার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা লিখেছিল—যিনি খাদ্য, পরিচ্ছদ ও প্রসাধন দ্রব্যের ওপর সার্টিফিকেট দেন, ক্লাব-লাইব্রেরীর উৎসবে বাণী পাঠান, যে-কোন অভাজনের ছেলের বিয়েতে, মেয়ের অন্নপ্রাশনে আশীর্ব্বাদ জানান—তাঁর মতামত ইণ্ডিয়া রবারের মতো স্থিতিস্থাপক। এমনি আরো অনেক কথা। পত্রিকাটা আমরা লুকিয়ে ফেলেছিলাম—কিন্তু কোন অতি-উৎসাহীর চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত তা কবির হাতে গিয়ে পড়ে। কবি অতিশয় ব্যথিত হন এতে এবং বলেন—'ওঁরা বোধ হয় মনে করেছেন যে এ-সব থেকে আমি যৎকিঞ্চিৎ বাণিজ্য করি। নইলে এত উষ্মার কারণ কি? আমি যে কবি মাত্র সে আমি জানি—কিন্তু দেশের শিল্প-বাণিজ্য থেকে সুরু করে, পারিবারিক

উৎসব-অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আমাব ডাক পড়ে। এটা আমিও খুব সৌভাগ্য বলে মনে করি তা নয়, কিন্তু তাই বলে ঝাড়তাব সঙ্গে কাককে ফিবিযে ত দিতে পারি না। আব তা দিলেও কি ধিক্কাবেব হাত থেকে অব্যাহতি আছে? চাবিদিক জুড়ে হৈ-হৈ উঠবে, দেখো, দেখো, ববিবাবুর দেশের প্রতি দবদ নেই—দেশবাসীব প্রতি দাক্ষিণ্য নেই!'

কবিব এই স্বাভাবিক সৌজন্য যে তাঁব একটা দুর্ব্বলতাই ছিল, সে কথা অস্বীকাব কবাব উপায নেই। মহৎ চবিত্রেব এই দুর্ব্বলতা কাকব কাকব কাছে কৌতুকাবহ ঠেকলেও, আমার কিন্তু এতে ভাবী কষ্ট হত মনে। কষ্ট হত না যদি এ-সবেব ফলে ইতস্তত যে প্রতিকূল আলোচনা হত, তা তিনি অনাযাসে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পাবতেন। তা তিনি পাবতেন না—ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে-কোন টিপ্পনী বা ইঙ্গিত-আক্রমণই তাঁকে ক্লিষ্ট কবতো। তিনি প্রত্যুত্তব দিতে পাবতেন না কোন ক্ষেত্রেই, তাই ক্লেশটা তাঁর এক-এক সময অব্যক্ত অস্বস্তিব আকার ধরতো।

মনে আছে, সর্ব্বভাবতীয়তাব প্রয়োজনে 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতেব শেষাংশ বর্জ্জন অনুমোদন করায় কোন কোন

সংবাদপত্র তাঁকে প্রবল আক্রমণ করেছিল। একটি পত্রিকা এই উপলক্ষে তাঁকে অহিন্দু, দেশদ্রোহী, পিবালি অনেক কিছুই বলেছিল। কবি এত বেশী আহত হয়েছিলেন এই ঘটনায় যে তাঁর তুষারশুভ্র মুখমণ্ডল ঘৃণা ও উষ্মায় লাল হয়ে উঠলো। বললেন, 'মানুষের বংশ তুলে গালাগালি দেওয়া—মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত করা—এরি নাম দেশ-সেবা। এই সেবার সেবায়েত যাঁরা, তাঁদের নামে দেশে ধন্য-ধন্য পড়ে যাবে।' প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন একজন প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের কথা—যিনি তাঁর ধর্ম্মমত নিয়ে আলোচনা করতে বসে, ঠিক একই ভাবে তাঁর পারিবারিক সম্ভ্রমের ওপর আঘাত করেছিলেন। সে-লেখা আমি পড়েছিলাম, কিন্তু তা যে আবার কবির হাত পর্য্যন্ত এসেছে, এ আর কেমন করে জানবো? হেসে বললেন কবি, 'শুধু কি লিখলেই হল? যাকে মারা হয়েছে, তার ত জিনিষটা টের পাওয়া চাই। তাঁরি হিতৈষী কেউ কাটিং পাঠিয়েছিলেন আমায়।'

আর একদিন আমাদের দেশের এই রুচিহীন আক্রমণশীলতা নিয়ে কথা হয়েছিল। সেদিন কবি অন্য একটা ব্যাপারে আগে থেকেই একটু উত্তেজিত হয়ে ছিলেন। হঠাৎ শুনলেন, তাঁর 'জনগণ-মন-অধিনায়ক'

গানটি দিল্লীর দরবার উপলক্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জের উদ্দেশে লেখা বলে কোন কাগজ মন্তব্য করেছে। উত্যক্ত হয়ে কবি বললেন, 'দেশের অসংযত রসনা চিরদিন শুধু আমার উদ্দেশে বিষই উদ্গার করে চলেছে। আমার সমস্ত কাজ, সমস্ত প্রচেষ্টাকে হীন প্রতিপন্ন করার কি অদম্য উৎসাহ! কোন একটা বিষয়ে যদি মনের মতো হয়ে চলতে না পারলাম, তাহলেই সারা জীবনে যা-কিছু করেছি, সঙ্গে সঙ্গে তা ধূলিস্মাৎ করে দিতে কারুর বাধে না। যৌবনে লিখেছিলাম, সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে—যাবার আগে ঐ পঙ্‌ক্তিটি কেটে দিয়ে যাবো আমার রচনা থেকে।'

দেশ সম্বন্ধে এই ধরণের একটা ক্ষোভ তাঁর মুখ দিয়ে সময়ে-অসময়েই বেরুতো। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় দেশ তাঁকে যোগ্য সমাদর দেয় নি—এ ধারণা কেমন করে জানি না শেষ জীবনে তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী কুৎসাপরায়ণ ক্ষুদ্র লোক আজীবনই তাঁর অনুগ্রহে পুষ্ট হয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে, এ কথা সত্যি, কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারী যে তাঁকে কত ভালোবাসা দিয়েছেন, তা তিনি অভিমানের ঝোঁকে কখনো কখনো ভুলে যেতেন! চেপে

ধরা হল একদিন তাঁকে এই নিয়ে—উচ্ছ্বাস সহকারে বললেন একজন, এই যে এত রকম দাবী-দাওয়া আসে আপনার কাছে দিনের পর দিন, এ কি জন্যে? ভেবে দেখুন ত আজ দেশের শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে যে-ভাষায় কথা বলে, সে কার ভাষা? এমন কি দেশের ঘরে-ঘরে খুঁজে দেখুন, আপনার হাতের লেখার ছাঁদটি পর্য্যন্ত আজ দেখতে পাবেন সকলের খাতায়।

ক্রোধ জল হয়ে গেল কবির। প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর দুটি চোখ। বললেন, 'অস্বীকার করবো না যে কিছু পেয়েছি আমি এবং সে অনেক কিছুই। তবু ক্ষোভ থেকে যায় যে শিষ্টতার সীমানার মধ্যে দেখতে পেলাম না আমার প্রতিপক্ষদের।' অপ-সমালোচনা সম্বন্ধে কবির এই যে অসহিষ্ণুতা, এটাও দুর্ব্বলতা সন্দেহ নেই—এ সব ক্ষেত্রে উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্যই হত তাঁর মতো লোকের পক্ষে শোভন, কিন্তু তিনি স্বভাবত সুজন ছিলেন বলেই অন্যের অসৌজন্য তাঁকে এত বেশী পীড়া দিত।

বলাই বাহুল্য, তাঁর এই উত্তেজনা ও বিরক্তি সীমাবদ্ধ থাকতো তাঁর নিজের গণ্ডীর ভেতরে। বাইরে তাঁর ব্যবহারে শিষ্টতা ও মাধুর্য্যের ক্রম-ভঙ্গ হতে দেখিনি।

—১২—

রবীন্দ্রনাথের দরজা সকলের কাছেই অবারিত ছিল এবং ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে সব মানুষকেই তিনি সমান প্রীতি ও সৌজন্যের সঙ্গে নিতেন, এ-কথা আগেই বলেছি। এদিক থেকে যে কোন বাছাবাছির অভ্যাস ছিল না তাঁর, তা-ও বোঝাতে চেষ্টা করেছি তাঁর কথাবার্ত্তার আলোচনা প্রসঙ্গে। কিন্তু একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি সবিস্ময়ে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েও, অন্তরঙ্গ হতে পারতেন না কেউই—তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরাটতার কাছে নিজের অজ্ঞাতেই সকলে ছোট হয়ে যেতেন যেন। রামানন্দ বাবু প্রমথ বাবু, অবন বাবু প্রভৃতি তাঁর একান্ত নিকট আত্মীয় এবং বন্ধুদেরও দেখেছি, তাঁর সঙ্গে হৃদ্য আদান-প্রদান করতে, আবার তারি ভেতর সুস্পষ্ট একটা সমীহের ভাব বাঁচিয়ে চলতে। চারুদত্ত তাঁর সাম্নে পাইপ খেতেন এবং খোস-গল্প করতেন যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই, তবু তিনিও বেশ একটু গা-বাঁচিয়েই থাকতেন। আপন স্বাতন্ত্র্য অটুট রাখার জন্যে কবির তরফ থেকে যে কোন প্রয়াস ছিল না, বরং হাস্য-পরিহাস করার, কথার পিঠে কথা বলার অভ্যাসই যে ছিল তাঁর প্রবল—আর এই অভ্যাসের আকর্ষণেই স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে যে তিনি ছিলেন

ষোল-আনা নিষ্কুণ্ঠ, এ আশা কবি অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং চেষ্টা করলে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া এমন কিছু কঠিন ছিল না—কিন্তু কোথায় জানিনা বাধতো সকলেরই। বোধ করি বাইরের এই তরল অভিব্যক্তির তলায় যে ভাব-নিমগ্ন বিরাট পুরুষের ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে ছিল, তার দিকে তাকিয়েই সকলের উৎসাহ যেতো স্তিমিত হয়ে। তাই বিশিষ্ট বা বিদ্বজ্জনের সঙ্গে তাঁর যে আদান-প্রদান, তা কোন দিনই অবিভেদ্য বন্ধুতায় পরিণত হতে পারতো না।

কিন্তু এদিক থেকে তথাকথিত প্রাকৃত জনেরা ছিলেন ভাগ্যবান। তাঁরা সরাসরি তাঁর সত্তার অন্দর মহলে গিয়ে ঘা দিতেন—আর সত্যিকার মনের কথা তাঁর হত তাঁদেরই সঙ্গে। আসলে কবি সত্যকার হৃদয়বত্তা বুঝতেন—তাই আপন হৃদয় অবারিত করে দিতেন তাঁদের কাছে, যা পারতেন না তথাকথিত নামজাদাদের বেলায়। পারবেন কি করে? তাঁরা নিজেরাই যে সহজ হতে পারতেন না তাঁর সামনে! কিন্তু বিশিষ্টতার বালাই যাঁদের ছিলনা, সবদিকেই যাঁরা সাধারণ, তাঁরা হৈ-চৈ করে কথা বলতেন তাঁর সঙ্গে—হট্টগোলে, দাবী-দাওয়ায় উদ্ব্যস্ত করে তুলতেন তাঁকে, তাই প্রকৃত প্রাণের স্পর্শ পেতেন তিনি তার ভেতর—আর

সেখানেই ধরা দিতেন নিজেকে সহজ হয়ে, সাধারণ হয়ে। তাঁর এই মানুষী বৈশিষ্ট্যটুকু কোন দিনই বোঝা যেতো না বিখ্যাতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায বা বাক-বিনিময়ে, যদিও বাইরে রবীন্দ্রনাথের সেই রূপটাই বেশী পরিচিত। তাঁর অমায়িকতার আসল চেহারা দেখেছেন তাঁর নিত্য দিনের সেবক, সহচর ও সঙ্গীরা।

এই আন্তরিকতা তাঁর সব চেয়ে বেশী প্রকট হত মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ-আলোচনায। এত রকম আব্দার ও জুলুম-জবরদস্তি আসতো তাঁর ওপর মেয়েদের তরফ থেকে যে সময সময আমাদের রীতিমতো বিরক্তিকর ঠেকতো। কিন্তু বিরক্তি তাঁর হত না কোন দিনই। তিনি অনুরোধে তাঁদের রাশি রাশি অটোগ্রাফের খাতা ভর্ত্তি করে দিতেন রকমারি ছোট-বড় কবিতায়, অনায়াসে বসে যেতেন তাঁদের সঙ্গে দল বেঁধে ছবি তোলাতে—অকুণ্ঠিত ভাবে শোনাতেন কবিতা আবৃত্তি করে, ক্যারিকেচিওর করে। কি ষোলো আর কি ছেচল্লিশ, কোন নারীর আবেদন তাঁর কাছে উপেক্ষিত হয়েছে, এর বোধ হয় নজীরই নেই! একদিন কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন মেয়েদের সম্বন্ধে—'জীবনে সত্যিকার জয়মাল্য পুরুষকে দেয় ওরাই। ওরাই হল নর-জীবনের

সঞ্জীবনী শক্তি। ভুল-ভ্রান্তি দোষ-ত্রুটি সব কিছু নিয়েই ওরা মহৎ। ওরা জীবনে আমায় দিয়েছে অনেক—আমার সৃষ্টির স্তরে স্তরে গাঁথা আছে তারি প্রেরণা!' মেয়েদের ঠিক এ-রকম করে ভালোবাসতে, এত প্রীতি ও সম্মানের সঙ্গে তাঁদের ভালোবাসাকে স্বীকার করে নিতে দেখেছি আর কাকে?

একটা জিনিষ এই প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের সাধারণত মা বলে সম্বোধন করতেন না। আমাদের এই অতি-প্রাচ্যামিটা কেন জানিনা কোন দিনই আমার রুচিকর ঠেকে না—যেন সর্ব্বদা একটা সীমানা বাঁচিয়ে চলার জন্যে কণ্টকিত হয়ে রয়েছি আমরা, আর তারি উপায় হিসাবে একটা নিরাপদ সংজ্ঞা আঁকড়ে ধরেছি! দেখে আনন্দিত হতাম যে রবীন্দ্রনাথ কি কথাবার্ত্তায় আর কি চিঠি লেখায়, এই বনিয়াদী সম্বোধনটা একেবারেই ব্যবহার করতেন না! মেয়েদের তিনি দেখতেন প্রধানত সখীত্বের দিক থেকে। সাহসে ভর করে একদিন কথাটা তুলেছিলাম। তিনি বললেন মৃদু হেসে, 'দরকার হয় কি কিছু? সমগ্র ভাবে নারীর যে মহিমময় ব্যক্তিত্ব, তাকে খণ্ডিত করে, একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা কেন? হতে পারে, এই গণ্ডীটা খুব বড়

—কিন্তু কল্যাণলক্ষ্মী রূপে নারীব যে সমগ্রতা, তাতে মাতৃত্বের চেয়ে সখীত্বের স্থান ত কিছু কম সম্মানের নয়।'

বিষয়টি নিয়ে অল্প একটু আলোচনা হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উঠেছিল দেশাচারের কথা, যাতে বৌদিদি বা শ্যালিকা ছাড়া অন্য কোন সম্পর্কেই সখীরূপে নারীকে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, স্বীকৃতিও নেই। সকল অবস্থাতেই সন্দেহ আর অবিশ্বাস থাকে প্রচণ্ড ভাবে পথ আটক করে। তাই নারীর বান্ধবতা লাভের আকাঙ্ক্ষা পুরুষকে চরিতার্থ করতে হয় এ-দেশে মাতৃ-সম্ভাষণের ছদ্ম-আবরণে আত্মগোপন করে। কবি বলেছিলেন তাতে স্মরণীয় একটি কথা—'এর চেয়ে বেশী অপমান করা হয় নারীকে আর কিসে, সে ত আমি ভাবতেই পারি না। অবাধ বান্ধবতার খোলা আকাশে অসুস্থতার কালো মেঘ দাঁড়াতে পারে না —কিন্তু এই পর্দ্দা-ঢাকা প্রতারণাই হল পাপের বাসা। যত অন্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এরি আনাচ-কানাচ দিয়ে।' অবাধ বান্ধবতার পরিণতি সম্বন্ধে তর্ক উঠলো— কবি বললেন তাতে, 'তাকে মর্য্যাদার সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়াই ত মানবতা-সম্মত। যদি অবাঞ্ছিত কোন পরিণতিই দেখা দেয় ইতস্তত, তাও জৈব স্বাস্থ্যের পক্ষে

ততটা ক্ষতিকর হয না, যা হয় এই অচলায়তনের দাসত্বে আবদ্ধ থাকলে।' কথাগুলি শুধু পুরুষের নয়, নারী-পুরুষ উভযেরই পক্ষে চিন্তনীয় বলে মনে করি।

কিশোরী মেযেদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্য ছিল সব চেযে বেশী দরাজ। দলে দলে আসতো তারা যখন-তখন তাঁর কাছে, ফুল নিযে, টুকিটাকি খাদ্যবস্তু নিয়ে, স্বহস্তকৃত সূচিকর্মের উপহার নিযে। অশীতিপর বৃদ্ধ কবিও দেখেছি তারা এলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই সংসার বন্ধনহীন কিশোর বালকের মতো প্রফুল্ল হযে উঠতেন। তাঁর টেবিলে অনেকে নিশ্চয দেখেছেন কয়েকটি করে লজেঞ্জেস-এর ফাইল—এগুলি সঞ্চিত থাকতো তাঁর এই তরুণ বান্ধবীদের জন্যে। কদাচিৎ তা থেকে এক-আধটা আমরাও খেয়েছি—একদিন বললেন কবি, 'কার জিনিষ কে খাচ্ছে হে? হায বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।' আমাদের দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন—ভারতচন্দ্রের এই লাইনটি যে প্রসঙ্গে বলা, তার প্রতি একটু বক্র ইঙ্গিতই করলেন বোধ হয়। একদিন বেশ বিপাকেই পড়েছিলেন কবি। তিনি নিবিষ্ট মনে লিখছেন, এমন সময কয়েকটি তরুণী এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর কাছে। কলহাস্যে চমকিত হয়ে তাকালেন তিনি, তারপরই বললেন, 'ইস তোরা আমার

ধ্যান-ভঙ্গ করে দিলি! জানিস ত লোকে আমাকে একটা জ্বলজ্যান্ত ঋষি বলে মনে করে?'

কথাটা সহজ ভাবেই বলেছিলেন তিনি, কিন্তু ঋষিদের ধ্যান-ভঙ্গেব সঙ্গে তরুণী-আবির্ভাবেব যে ঐতিহ্য রয়েছে পুবাণে, তাই স্মবণ কবেই মেয়ে ক'টি কেমন একটু বিব্রত হয়ে পড়লো। কবিবও জিনিষটা বুঝতে দেবী হল না। তিনি ব্যপারটা মানিয়ে নেবাব জন্যে উচ্চহাস্য করে বললেন, 'বল, শুনি কি কবতে হবে আমায়!'

মোটেব ওপব দেখেছি মেয়েবা অতি সহজেই তাঁর অন্তর-লোকে প্রবেশ কবতে পাবতেন। সব চেয়ে আন্তবিক ও অকপট প্রকাশই বোধহয হত তাঁর মেয়েদেব কাছে—রাণী দেবী, হেমন্ত বালা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী প্রভৃতিব কাছে তাঁব লেখা চিঠি গুলিতে বা নন্দিতা দেবী, দ্বিতীয়া রাণী দেবী প্রভৃতিব সঙ্গে প্রাত্যাহিক আলাপে যে অন্তবঙ্গ রূপটি পবিস্ফুট হযেছে তাঁব, অন্য আর কারুব কাছেই তাঁব শেষ জীবনেব পরিচিতি অত নিবিড় ও ব্যাপক হযে প্রকাশ পেযেছে কিনা সন্দেহ! ছেলেদের এ হিসাবে ঢেব বেশী পেছনে পড়ে থাকতে লক্ষ্য কবেছি, আর যশস্বীদেব ত দেখেছি একেবাবেই সদর উঠানে দাঁড়িয়ে থাকতে!

কবি জানতেন, মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর এই সহজ নমনীয়তা নিয়ে অনেকে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে থাকেন—দু-একটা অপ্রীতিকর টিপ্পনী বা আলোচনাও তাঁর নজরে পড়েছে। একদিন বললেন তিনি, 'ওদের মনের অভ্রভেদী অশুচিতা পদে-পদে আমায় ক্লিষ্ট করে!' তারপর বললেন তিনি, 'জীবনে যা সুন্দর, যা মহৎ, তাকে মর্য্যাদার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারে না ওরা—ওদের সংস্কার-মূঢ় মন তাই অপভাষণে মুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সন্ধান যে পেয়েছে, সে কি করে অস্বীকার করবে, মানুষের কর্ম্ম-সাধনায় মেয়েদের প্রবর্ত্তনার দাম কত খানি? সেই অপরিসীম দানকে ন্যায্য মূল্যে গ্রহণ করতে না পারার দৈন্য আমায় লজ্জা দেয় সব চেয়ে বেশী।' মেয়েদের এত বড় মর্য্যাদা আর কে দিয়েছেন আমাদের এ-কালে?

—১৩—

অভিনয়, আবৃত্তি, গান ও বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথের কি রকম অনায়াসসাধ্য ছিল এবং এই সমস্ত কারুকর্মে তাঁর দক্ষতাই বা কতটা ছিল, সে সম্বন্ধে দু-এক কথা লিখতে অনুরোধ করেছেন কেউ কেউ। বিষয়টি আলোচনার যোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার পুঁজি অত্যন্ত কম—বিশেষত গান ও অভিনয়ের ব্যাপারে।

গান তাঁকে গাইতে শুনেছি মাত্র কয়েক বার—কোন আসরে বা উপলক্ষে নয়, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মধ্যেই। একদিন গেয়েছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ স্বদেশী গান 'আমায় গাহিতে বলো না।' দম রাখতে পারছিলেন না, গলা চেপে আসছিল থেকে থেকে, কিন্তু ওরি ভেতর এক-একটা টান যা দিচ্ছিলেন, তা অদ্ভুত। কতখানি তৈরী গলার অধিকার যে ছিল তাঁর এক সময়, তা বুঝেছিলাম ঐ থেকেই। যৌবনে তিনি দেশকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন গান গেয়ে—সে-শক্তি তাঁর অন্তর্হিত হয়েছিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, সে আমাদেরি দুর্ভাগ্য! আর একদিন গেয়েছিলেন 'আমার শেষ পারাণির কড়ি'— সে-ও বিনা যন্ত্রে এবং একই রকম স্খলিত কণ্ঠে। শুনেছি আরো দু-একটা গান, কিন্তু গাওয়া বলতে যা

বোঝায়. শেষের দিকে তা আব হয়ে উঠতো না তাঁর দ্বাবা। একদিন বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে তাঁর অল্প বযসের কথা, যখন গঙ্গায় নৌকা ভাসিযে দিযে তিনি গান ধরতেন, আব আশপাশের ঘাটে নব-নারী সচকিত হয়ে উঠতেন তাই শুনে। জ্যৈদাদা অর্থাৎ জ্যোতিবিন্দ্রনাথের কথা, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' অভিনয়ের কথা, আরো অনেক অতীত ইতিবৃত্তই বলেছিলেন তিনি ঐদিন।

একদিন দুপুরে গুণ গুণ কবে গাইছিলেন 'কালেব মন্দিবা যে সদাই বাজে'—একটু স্ফুট কণ্ঠে গাইতে অনুরোধ কবায় বললেন কবি, 'দত্তাপহারক সে-গলা আমাব কেড়ে নিযেছেন। যেদিন ছিল, সেদিন তোমরা ছিলে না। কি কবে বোঝাবো তোমাদের? আজ নিষ্ফল চেষ্টা শুধু নিজেকেই আঘাত করে। ও-অধ্যায় আমার শেষ হযে গেছে হে।' কথাটায় কোথায় ছিল একটা প্রচ্ছন্ন বেদনাব সুব, যা তাঁবি প্রসিদ্ধ কবিতাব গায়ক ববজলালেব কথা মনে কবিয়ে দিযেছিল। এই একই কথা শুনেছি তাঁব মুখে আবো দু-একদিন।

কিন্তু গাইবাব ক্ষমতা অন্তর্হিত হযে গেলেও, গান তাঁব প্রাণ থেকে সবে যায়নি কোনদিনই। 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'তাসের দেশ'·· সবগুলি নৃত্য-

নাট্যের গান তিনি রচনা করেছিলেন এই সময়ে এবং নিজেই প্রত্যেকটি গানে সুর সংযোজনা করেছিলেন! যিনি না দেখেছেন, তিনি কিছুতেই বুঝতে পারবেন না, তাঁর কি অসামান্য ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা ছিল কথার সঙ্গে সুর বসানোর—সঙ্গে সঙ্গে হাতে রচনা করে যাচ্ছেন, আর মুখে সুর দিয়ে যাচ্ছেন, এবং সেই কথা ও সুর তুলে নিচ্ছেন শৈলজা বাবু, ইন্দুলেখা দেবী, শান্তিবাবু - দেখে আমার অবাক লাগতো! আরো অবাক লাগতো, এই সব গানে আদৌ সুর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে দেখে! সে সব গান ত সবাই শুনেছেন—বেশীর ভাগই তার বললে বক্তৃতা, কইলে কথা!

'বিসর্জ্জনে' ও 'তপতীতে' তাঁর অভিনয় দেখেছি—সে-রকম অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কখনো হয়নি, হতেও পারে না। কিন্তু সে-দিকের আলোচনা এই স্মৃতি-কথার মধ্যে আসে না। আমি শান্তিনিকেতন যাওয়ার পর আর কোন ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হতে দেখিনি তাঁকে—তিনি প্রত্যেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন, কদাচিৎ কিছু আবৃত্তি করতেন, অথবা গানের সঙ্গে এক-আধবার গলা মেলাতেন। বার্দ্ধক্যে শরীরের ক্রমবর্দ্ধিত অসামর্থ্যই অবশ্য দায়ী এজন্যে।

আবৃত্তিতে তাঁর যে অসামান্যতা লক্ষ্য করেছি, তা কোনদিন ভুলবার নয়। একদিন বসে বসে 'সতী' নাটিকটি পড়ে শুনিয়েছিলেন সকলকে—বহুবার পড়া এই নাটিকাটি যে কত মনোরম, তা প্রথম বুঝতে পারলাম সে-দিন। একজন বিখ্যাত নটও ছিলেন শ্রোতাদের মধ্যে—তিনি ত আবেগে গলদশ্রু হয়ে উঠেছিলেন শুনে। 'মাঘের সূর্য্য উত্তরায়ণ পার হয়ে এলো যবে', 'রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি', 'বহুদিন হল কোন ফাল্গুনে', 'তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে'—কত কবিতাই আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন তিনি! কখনো গম্ভীর প্রাণবন্ত মন্ত্রধ্বনির মতো, কখনো উচ্ছল জল-প্রপাতের মতো, কখনো দূরাগত বীণাতন্ত্রীর স্তিমিত এক-একটি টানের মতো · গলা তাঁর তালে তালে উঠতো পড়তো, তারি সঙ্গে ছিল তাঁর সেই অভূতপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর। এ আবৃত্তি যিনি না শুনেছেন, জীবনে তিনি খুব বড় একটা সম্পদ থেকেই বঞ্চিত হয়েছেন। আবৃত্তির প্রাণবস্তু নিয়ে কথা উঠতে একদিন বলেছিলেন তিনি, 'আবৃত্তি আর অভিনয় দুটো স্বতন্ত্র শিল্প—কিন্তু দেখেছি, অনেকেই দুটোকে অভিন্ন মনে করেন। তাই গলা কাঁপিয়ে এবং হাত্-পা নেড়ে আস্ফালন করাকে তাঁরা চালিয়ে দেন আবৃত্তি বলে। আবৃত্তিতে করণীয় অংশ কিছু নেই,

ওটা বাচন শিল্প—অভিনয় আনুষ্ঠানিক শিল্প, আকারে সমধর্ম্মিতা থাকলেও তাই প্রকাণ্ড প্রকার-ভেদ রয়েছে দুটোর মধ্যে।' তবু অভিনেতা এবং আবৃত্তিকারীরা কথাটা স্মরণ রাখলে উপকৃত হবেন আশা করি।

সব চেয়ে অপূর্ব্ব ছিল কবির বক্তৃতা। বক্তৃতা তিনি সাধারণত দিতেন লিখে এনে—খুব আস্তে আস্তে সুরু হত, তারপর ক্রমশ বক্তব্য যত জমাট হয়ে উঠতো, গলা চড়তো—অবশেষে তা পৌঁছুতো একটা অনির্ব্বচনীয় ধ্বনি-গাম্ভীর্য্যের স্তরে। এত দ্রুত, এত উচ্ছল, এত আবেগ-চঞ্চল হয়ে উঠতো তাঁর ভাষণ যে শ্রুত-লেখন নেওয়া প্রায়ই হয়ে পড়তো দুষ্কর। রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সে-রকম বক্তৃতা তাঁর অনেকেই শুনেছেন সম্ভবত।

মৌখিক বক্তৃতাও তাঁর ছিল খুব রমণীয়—জন্মতিথি উৎসবে, মন্দিরের উপাসনায়, শিক্ষা-পরিষদের বৈঠকে অনেকবারই শুনেছি তাঁর সে-রকম বক্তৃতা। অলিখিত বক্তৃতার শ্রুতলিপিও নিয়েছি দু-একবার—কবির স্বহস্ত সংশোধিত সেই রকম একটা বক্তৃতার কপি এখনো রয়েছে আমার কাছে। একদিন বক্তৃতা দেওয়ার পর কবি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—বললেন, 'দেশে-

দেশে ফিরেছি গলা-ফেরী করে। আর পোষাবে না এ আমার। বাক-যন্ত্রকে ছুটি না দিলে দেহ-যন্ত্রই বিকল হয়ে পড়বে শেষ পর্য্যন্ত।' তাঁর বক্তৃতায় একটা জিনিষ ছিল বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার—বক্তৃতা তাঁর হাতে আসলে হয়ে দাঁড়াতো এক-একটা প্রবন্ধ—শুধু ভাষণের গুণেই তাকে বলা চলতো বক্তৃতা। শব্দ-প্রয়োগের কারিকুরি, সাদৃশ্য-আরোপের কৌশল, বাক্ ভঙ্গীর চাতুর্য্য তারি সঙ্গে অনবদ্য কণ্ঠস্বর নিয়ে জমে উঠতো তাঁর ভাষণ। তাই তার আবেদন কোন দিন বিদগ্ধ-সমাজের বাইরে ব্যাপ্ত হত না, যা হয় বক্তৃতা মঞ্চের পেশাদার বক্তাদের বক্তৃতায়—কিন্তু বচনের সঙ্গে বাচনের সংযোগে তাঁর বক্তৃতা যে কতখানি অপূর্ব্বতা লাভ করতো, তা যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন। আমার কাণে এখনো বাজছে ৭ই পৌষের সেই বক্তৃতা—যা তিনি দিয়েছিলেন চীন-জাপান যুদ্ধের সূচনায়। 'সভ্যতার সঙ্কট' ছাড়া বোধ হয় এ-রকম স্মরণীয় ভাষণ তিনি আর দেনই নি শেষ জীবনে।

ঐ দিনটি আমার মনে রয়েছে আরো একটা কারণে। ঐ দিন তিনি তাঁর স্বহস্ত-স্বাক্ষরিত একটি ফটোগ্রাফ উপহার দিয়েছিলেন আমায়, আর দিয়েছিলেন 'নাগিনীরা

চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস’ কবিতাটি। ‘প্রান্তিকে’র এই কবিতাটির প্রতিলিপি আমার অন্য একটি বইয়ে মুদ্রিত হয়েছে—ছবিটি দিলাম এই বইয়ে। এ দুটি অমূল্য আশীর্ব্বাদ আমি সযত্নে বহন করে চলছি আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঞ্চয়রূপে।

— ১৪ —

রবীন্দ্রনাথ যেমন অলোকসামান্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর অটুট স্বাস্থ্য ও অদম্য কর্ম্মশক্তি। এতগুলি জিনিষের একত্র সমাবেশ খুব কদাচিৎ হতে দেখা যায়। সেই দুর্লভ সংঘটন হতে পেরেছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের জীবন জ্ঞানে-কর্ম্মে এতখানি সার্থক হতে পেরেছিল। চুয়াত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর বড় রকমের কোন অসুখই হয়নি বলতে গেলে। প্রথম বড় অসুখ তাঁর সেই প্রসিদ্ধ বিসর্প রোগের আক্রমণ—যার ফলে কয়েক দিনের জন্যে তাঁর সংজ্ঞা বিলুপ্তি হয়েছিল। সে-যাত্রা যখন তিনি বিস্ময়কর রূপে রক্ষা পেয়ে গেলেন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন যে যদিও কবির জীবনটা কোন রকমে বাঁচলো, তবু তাঁর সৃজনী-প্রতিভা সম্ভবত আর অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—ধীরে ধীরে কবির দেহের স্বাস্থ্য ও মনের স্বস্তি আবার ফিরে এলো। পূর্ণোদ্যমেই আবার চলতে লাগলো তাঁর লেখা, আঁকা এবং যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম। এই সময় থেকে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কবিতা-গান, গল্প, নাটক-নাটিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ যা তিনি লিখেছেন, বহু আজীবন সাহিত্য-ব্রতীর সঞ্চয়ও সচরাচর

ততটা হতে দেখা যায় না। শুধু পরিমাণেই নয়, উৎকর্ষেও তাঁর জীবনের এই সর্ব্বশেষ ফসলে বিশেষত্ব বড় কম নেই। কিন্তু ও-দিককার কথা এখানে থাক।

এই রোগ-মুক্তির পর রবীন্দ্রনাথের চেহারায় সুস্পষ্ট পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল—মাথার সামনের দিকে দেখা দিয়েছিল অল্প টাক, দাড়ি হাল্কা হয়ে গিয়েছিল এবং সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়েছিল বেশ একটা লক্ষণীয় কৃশতা। ছবিতে শেষ জীবনে দেবেন্দ্রনাথকে যেমন দেখায়, দূর থেকে তাঁকেও অনেকটা সেই রকম দেখাতো। এই অবস্থাতেই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।

এরপর ইতস্তত যাওয়া-আসার পথে যখনি তিনি কলকাতায় থেমেছেন, তখনি দেখা হয়েছে। কিন্তু ভালো করে দেখাশুনা আবার হয়েছে তাঁর সঙ্গে, যখন তিনি শেষ রোগশয্যায়। তাঁর আশী বৎসর বয়সের জন্মতিথি উপলক্ষে ঠিক হল, 'যুগান্তরে'র একটি বিশেষ সংখ্যা বের করা হবে—এবং এই সংখ্যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্তই দেওয়া হবে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত ঢাকাবাসীর সাহায্যে গঠিত ধন-ভাণ্ডারে। গেলাম এই উপলক্ষে কবির আশীর্ব্বাণী ও তাঁর সেই সময়কার একখানি ছবি সংগ্রহ করতে।

শান্তিনিকেতনে তখন চলছে গ্রীষ্মাবকাশ—ছেলে-

মেয়েরা নেই, অধ্যাপকেরাও অনেকেই অনুপস্থিত। নন্দলাল বাবু, ক্ষিতিমোহন বাবু আছেন, কৃপালনী আছেন—আর আছেন সপরিবারে রথীন্দ্রনাথ ও কবির অন্তরঙ্গ কর্ম্মী দু-চার জন। শান্তিনিকেতনের এমন নিঃসঙ্গ নীরব চেহারা আর কোন দিন দেখিনি।

কবি তখন রয়েছেন উদয়নের একতলায়—শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন, উঠতে-বসতে পারেন না, কানে খুব কম শোনেন, মানুষও চিনতে পারেন অতি কষ্টে। সুধাকান্ত বাবু তাঁর স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে জানালেন অতিথির আবির্ভাব। কবি মৃদু হাস্য করে বসতে বললেন। পায়ের কাছে একটা মোড়া নিয়ে বসলাম—সারা গায়ে একটা পুরু চাদর ঢাকা ছিল, শুধু বাইরে বেরিয়েছিল তাঁর পাণ্ডুর মুখমণ্ডল। কবি বললেন, 'বিকেলের দিকে বড়ই অভিভূত থাকি, প্রাতঃকাল এলে যেন কতকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে আবার।' মনে হল, কথা বলতেও ক্লেশ হচ্ছে তাঁর। আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাতে লাগলাম—দেখলাম, পা দুটো বেশ ফুলেছে। কবি বুঝলেন। হেসে বললেন, 'মরণ চরণে শরণ নিয়েছে। আর তাকে বিমুখ করবো না হে।' কান্না পেতে লাগলো—অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। বুঝলাম আর দেরী নেই।

কিন্তু দেখে আনন্দ হল যে অন্তিম অধ্যায়ে পৌঁছিয়ে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত একটা আত্মসমর্পণের ভাব —কোন দ্বিধা নেই, বেদনা নেই, পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গেই যেন তিনি জীবনটি অঞ্জলি দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বললেন, 'অনেক দিন বেঁচেছি—বিধাতার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই—তিনি দিয়েছেন অনেক, এই হাত দিয়ে করিয়েও নিয়েছেন অনেক। আজ যবনিকা পড়ার আগে এই কথাটাই স্মরণ করে যাবো কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।' ওরি ভেতর তিনি কিন্তু তাঁর আতিথ্যটুকু ভোলেন নি। হেসে বললেন, 'টাকশাল, চা খাইয়েছো ত? ওরা আবার সাংবাদিক—মনে থাকে যেন!' টাকশাল হলেন টাকশিরস্ক সুধাকান্ত বাবু।

পরের দিন প্রাতঃকালে দেখলাম কবিকে অনেকট ঝরঝরে। উদয়নের বাগানবাড়ীর দিককার ঘরে একটা আরাম কেদারায় তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রতিমা দেবী ও নন্দিতা দেবী বসে আছেন দুটো ছোট চৌকিতে। ঢুকতেই পুরাতন কণ্ঠে সম্ভাষণ জানালেন কবি। ছোট একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলাম। সংবাদপত্রে আছি বলে রাজনীতির কথাই উঠলো সবার আগে। বললেন, 'মানুষের লালসা, তার হিংস্র স্বাজাত্যবোধ আবার যুদ্ধের

আগুন জ্বালিয়ে তুললো—দেখো এই আগুন আস্তে আস্তে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াবে। এই সার্ব্বভৌম কুরুক্ষেত্রের শেষ আমি দেখে যাবো না—কিন্তু এই আশা নিয়েই যেতে চাই যে ভারতবর্ষ এই অগ্নি-স্নান করে মুক্ত হবে, আর সেই মুক্ত ভারত দেবে জগৎকে নূতন শান্তি·· ।'

অল্পদিন আগেই তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তৃতা 'সভ্যতার সঙ্কট' বেরিয়েছে—দেখলাম তারি সুরটা তখনো অনুরণিত হচ্ছে। তিনি বললেন, 'আশা করেছিলাম, মানুষের শুভবুদ্ধি বুঝি শেষ পর্য্যন্ত তাকে পরিহার করবে না—তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব একদিন তাকে নিয়ে যাবে শান্তির দিকে, কল্যাণের দিকে, মৈত্রীর দিকে। কিন্তু কৈ হল তা? আমার বা মহাত্মাজীর সাধনা ত আজ একটা এনাক্রনিজম (কালাতিক্রমণ)—হয়ত ফ্যাসিষ্ট দেশ হলে আমাদের Concentration Camp-এ থাকতে হত। ব্যর্থতা বৈকি! এতখানি ব্যর্থতা দেখার জন্মেই আমাদের এতদিন থাকতে হল।'

ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে এলো কবির কণ্ঠস্বর। দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে বললেন, 'আমার আর সময় নেই—কিন্তু তোমরা, তোমরা আর ভুল করো না। আর ক্ষুদ্র স্বার্থের কাড়াকাড়ি নিয়ে তোমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

থেকোনা—তোমরা এক হও। এই এক হতে না পারার বিপাকেই নিষ্ফল হয়ে গেছে আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত আয়োজন। একদিন আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলাম আমিও—কিন্তু কি হল? সবার অলক্ষ্যেই ভেতরকার অশিব বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো—দেখা দিলে অন্যায়, অনৈক্য সরে আসতে হল।'

কথাগুলো তিনি সমস্ত সংবাদপত্রকে লক্ষ্য করেই বলেছিলেন মনে করি। বিশেষ সংখ্যা 'যুগান্তরে'র জন্যে যে বাণী দিয়েছিলেন, তাতেও এই ঐক্যের আহ্বানটাই খুব সংহত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। দাঙ্গার বিষয়ে আরো বললেন তিনি, 'কি অসহিষ্ণুতা! কি নিরর্থক ক্ষমতালাভের দম্ভ! দু-জনেরই চুলের ঝুঁটি ধরে আছে অন্য লোক শূন্য থেকে—কিন্তু আত্মবিস্মৃতের দল তা টের পাচ্ছে না, পরস্পরকে আঘাত করছে শুধু আত্ম-প্রতিষ্ঠার আত্মঘাতী উত্তেজনায়। আর তথাকথিত জাতীয়তাবাদ খালি উৎসাহিত করছে—লাগাও, লাগাও! এই রক্তমাখা পথের লক্ষ্য কোন রসাতলের দিকে, সে-কথা ভাবারই অবসর নেই কারুর।'

কথার স্রোত অন্যদিকে ফিরলো। আমার তখনকার একখানা বই তিনি পড়েছিলেন এবং সেই বইটির ওপর একটি পত্রাকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'কবিতা' পত্রিকায়।

এই সস্নেহ অনুগ্রহের উল্লেখ করে একটু কৃতজ্ঞতা জানালাম। হেসে বললেন কবি, 'ভয় করে আজ-কাল তোমাদেব লেখা পড়তে। ঠিক বুঝতেই পারি না কি তোমাদেব বক্তব্য। সময়-ধর্ম্মে একটা কথা আজ এসেছে, 'বুর্জ্জোযা'-- যাকিছু অনভিপ্রেত, যাকিছু আপন অভিমতেব প্রতিকূল, তাকেই তোমবা বলছো বুর্জ্জোয়া। সভ্যতাব ইতিহাসে বুর্জ্জোয়াদেব অভ্যুদয় ত একটা স্তব—সে স্তরে যা শিল্প বা সাহিত্য হয়েছে, তা কি তোমবা বলবে কিছু নয?' সবিনযে বললাম, 'তা ত বলিনি আমি—বুর্জ্জোয়া-অবুর্জ্জোয়া নির্ব্বিশেষে সাহিত্য ও শিল্পের একটা নিজস্ব মূল্য আছে, যা সকল কালেব জন্যেই—এই কথাই ত আমি বলতে চেয়েছি।' 'সেই টুকুই সান্ত্বনা', বললেন কবি, 'কিন্তু এটা প্রায়ই দেখি না আজ-কাল। রাজনীতির মতো সাহিত্যেও আজকাল কোমব বেঁধে Regimentation প্রবর্ত্তনেব চেষ্টা হচ্ছে। এটা হয়েছিল রাশিয়ায়ও। দেখেছি, চেকভকে একদিন অপাংক্তেয় কবা হল—কিন্তু চললো কি তা? রুশরা আজ লাখে লাখে সেক্সপীয়ার পড়ছে, গোযেটে পড়ছে।'

বেলা হল। কবির মাসাজ ও আহারের সময় সন্নিকট। আমবা উঠে পড়লাম।

বিকলের দিকে কবির অবস্থা হঠাৎ অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়লো। দুপুরে রোজই তাঁর একটু করে জ্বর হত—সেদিনও হয়েছিল। তবু ওরি ভেতর কেন জানি না, তিনি খানিকক্ষণ বসিয়ে দেবার জন্যে জেদ ধরলেন। বসিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু এই উঠিয়ে বসানোর শ্রম তাঁর দুর্ব্বল স্বাস্থ্যে সহ্য হল না। চীৎকার করে বললেন তিনি, 'শুইয়ে দাও, শুইয়ে দাও আমাকে'। রথীবাবুর বৈঠকখানায় আমরা জনা তিনেক তখন মৃদু কণ্ঠে গল্প-গুজব করছি—কবির স্বর শুনে দৌড়ে এলাম। ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। অপচিত স্বাস্থ্যেও কি বিরাট শরীর তাঁর। তিন জনে কি পারি তুলে আনতে? কিন্তু যে সৌভাগ্য জীবনে কোন দিনই হত না, এই উপলক্ষে হয়ে গেল সেটা—কবির দুটি বাহু আপন হাতে ধরতে পারলাম এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে গেল তাঁর মাথাটি আমার বুকের ওপর।

বিছানায় শুইয়ে দেবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কবি খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ঘন ঘন হাই উঠছে, চোখ দিয়ে জল বেরুচ্ছে—শরীর একটু একটু কাঁপছে। তারপর আস্তে আস্তে কতকটা সুস্থ হলেন। বললেন, 'এই ক্ষয়িত দেহ-যন্ত্রটা থেকে থেকেই বিকল হয়ে

পড়ে। একে আর বহন করার কোন অর্থ হয় না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ফল যেমন আপন প্রাণ-শক্তিতেই পূর্ণতা লাভ করে, তারপর আপনিই একদিন বৃন্তভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে, মানুষের অবসান ত তেমন করে হয় না। তার জীবনের জন্যে যেমন, মৃত্যুর জন্যেও তেমনি চাই সংগ্রাম।'

রাত্রে কবির সুনিদ্রা হল না। থেকে থেকে খালি ঘুম ভেঙে যায়, আর অস্ত্র-ঘটিত উপসর্গ তাঁকে অধীর করে তোলে। ওখানকার ডাক্তারবাবু প্রাণপণ চেষ্টায় মধ্যরাত্রের পর থেকে কবির অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারলেন। তাঁর ঘুম এলো। পরের দিন সকালে আবার উদয়নের সেই বারান্দায় দেখলাম কবিকে—অনেকটা সুস্থ, অনেকটা সজীব। রথীবাবু বললেন, 'অপারেশনটা এড়ানোর চেষ্টা হচ্ছিল—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আর দেরী করা চলে না।'

এই রোগশয্যাতেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সেবার বিরাম ছিল না। শুয়ে শুয়েই তিনি গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ পূর্ণোদ্যমে লিখে চলছিলেন। লেখা মানে অবশ্য মুখে-মুখে বলা—অন্যেরা শ্রুত-লেখন নিতেন। 'গল্পসল্প' 'জন্মদিনে', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য' প্রভৃতি বই তাঁর

এই সময়কার লেখা। এছাড়া লিখেছিলেন দুটো গল্প এবং অজস্র ছড়া—সবই মুখে-মুখে বলা। কি করে যে এই ভাবে লেখানো সম্ভব হচ্ছিল তাঁর, বুঝতেই পারি নি! আগে দেখেছি, বিশেষ অসুস্থ শরীরেও তিনি স্বহস্তে লেখনী না ধরলে, কোন জিনিষ লিখে শান্তি পেতেন না— একবার সর্ব্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনে বক্তৃতা পাঠানোর জন্যে যখন আমন্ত্রণ আসে, কবি তখন ছিলেন বড়ই ক্লান্ত। বললেন, 'এটা না লিখতে হলেই যেন দক্ষিণ হস্ত প্রসন্ন হত হে।' আমি তাতে বলি—শ্রুত-লিখন নিতে পারি, যদি বলে যাবার সুবিধা হয়! হেসে উত্তর দেন কবি, 'হয় না হে, নল দিয়ে খেলে উদরপূর্ত্তি হয়ত হয়, কিন্তু আহারের তৃপ্তি আসে না। শুনেছি···নাকি dictate করে নাটক লিখতেন।' কিন্তু জরার আক্রমণে আজীবনের অভ্যাস তাঁকে পাল্টাতে হয়েছিল এবং দেখে চমৎকৃত হলাম, তাতেও তাঁর রচনা-শক্তির গতি-পথ অবরুদ্ধ হয়নি।

এই সব রচনার কতকাংশ তখন ছাপা হয়েছে, বেশীর ভাগই ছাপা হচ্ছে। সুধীরকুমারকে বললেন কবি, 'বাঙাল, ওঁকে দেখিয়ো হে, আমার এই অন্তিম অবদানগুলো।' 'গল্প-সল্প' পড়ে অবাক হয়ে গেলাম—তার

ভাষাব কি অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা! 'জন্মদিনে' বই থেকে বিশেষ সংখ্যা যুগান্তরেব জন্যে একটা কবিতা প্রার্থনা করলাম—বই-আকাবে প্রকাশের আগেই যেটা আমরা স্কুপ করতে পারবো। কবি সানন্দে সম্মতি দিলেন। আর একটি টাইপ-করা ছোট প্রবন্ধ দিলেন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে—একটি বিবৃতি গোছের লেখা।

আমার ফেরার সময় হয়ে গিয়েছিল—বিকেলেব গাড়ীতে রওনা হবো ঠিক কবে, বেলা আন্দাজ দশটার সময় গেলাম কবির কাছে বিদায় চাইতে। দেখলাম কবি খান কয়েক সাময়িক পত্র নাড়াচাড়া করছেন—চোখে সেলুলয়েডের চশমা, তাব প্রান্ত-সংলগ্ন কালো ফিতে গলায় পরানো রয়েছে। হেসে বললেন, 'বসো। কোন গোস্বামী এবং কোন চৌধুবী দেখছি যুগপৎ আমার উদ্দেশে অস্ত্র-নিক্ষেপ কবছেন—প্রথমের অভিযোগ, আমি ব্রাহ্ম-সমাজের লোক, সেই কাবণেই শ্রেণী-সচেতন—দ্বিতীয়ের অভিযোগ, আমি আন্তর্জ্জাতিকতার দোহাই দিয়ে জাতীয়তার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেছি—বঙ্কিমের খাঁটি সোনা নাকি মাটি হয়েছে আমার হাতে।......এই কি বর্ত্তমানে তোমাদের সমালোচনার মাপকাঠি হয়েছে নাকি? সাহিত্যকে কি তোমরা একটা কোন নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে না

ফেললে ধরতেই পারো না? এবং যেখানেই তোমাদের বাধে, সেখানেই তোমরা আঘাত করো—আক্রমণ করো?'

উত্তর কি দোব? আবহাওয়ায় প্রতিকূলতার ছায়া পড়েছে, তা ত দেখেছি নিজেই। যুগ-ধর্ম্ম! বললাম, 'শরীরের এই অবস্থায় আপনার এ-সবে মন না দেওয়াই বোধ হয় ভালো। ওঁরা যা বলেন বা বলছেন, তার ভেতর অনেক জায়গাতেই যুক্তির ফাঁক দেখতে পাই।' কবি বললেন, 'কিন্তু উচ্চকণ্ঠে আপন আপন উক্তি অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার উদ্যম দেখছো ত! এইটাই আমায় সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য করে। যেন আমার অভিরুচির প্রতিকূল যা, তা খারাপ না হয়েই যায় না—এম্নি একটা ভাব! এই মনোভাবের পেছনে রয়েছে মস্ত বড় একটা দম্ভ—বলতে পারো, সেটা উগ্র আধুনিকতার দম্ভ।' প্রথম রচনাটির উত্তররূপে লেখা একটা ছোট্ট নিবন্ধ দিলেন আমায় যুগান্তরের জন্যে। দ্বিতীয়টির উত্তরও লিখছিলেন —দেখলাম সেটা। পরে প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে। উভয় লেখাতেই তিনি ধরাবাঁধা কোন মতবাদের আওতায় ফেলে সাহিত্য-সৃষ্টির মনোভাবকে আঘাত করেছিলেন। অবশ্য নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও জীবনাদর্শের আবির্ভাবকে তিনি

তাই বলে স্বাগত করতে ভোলেন নি। শুধু বলেছিলেন, সেই নূতনত্বটা যেন সত্যি জাতের হয়।

এই সময় অতি-আধুনিক কবি দু-একজন তাঁদের বই পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে অভিমতের জন্যে। দেখলাম টেবিলে রয়েছে। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখেছো এ-সব? কিছু বুঝতে পারো?' অক্ষমতা স্বীকার করতেই হল। বললেন, 'প্রথমত এ গুলো কোন ভাষায় লেখা সেটা বোঝা দরকার—তারপর এগুলো কি জিনিষ, তা বোঝা দরকার। নানা জিনিষের ভগ্নাংশ—বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল, বিবর্ণ—হাতে নিলে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। মানুষের বোধ-শক্তিকে বিভ্রান্ত করার এই অনর্থক প্রয়াস কেন বলতে পারো?' বললাম, 'অতুলবাবু বলেছেন এ-সব বিশুদ্ধ ইয়ার্কি।' হেসে বললেন কবি, 'ঠিক তাই। শুধু পাঠকের সঙ্গে নয়, স্বয়ং কাব্য-লক্ষ্মীর সঙ্গেই।' একটু থেমে বললেন, 'বিলাতের যে-কোন ব্যক্তি যা করে, তাই কি তোমাদের মতে আদর্শ? সে-দেশেও যে মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হতে পারে, এটা কি স্বীকার করো না তোমরা?' কবি বৈকি, আমার নিজেরও ত তাই বক্তব্য, কাজেই চুপ করে রইলাম।

প্রণামান্তে বিদায় নিচ্ছি যখন কবি, বললেন, 'সম্ভব

হলে এসো আবার। পোঁটলাপুটলি নিয়েই বসে আছি —কখন নৌকো আসবে ঠিক নেই ত তার!' সময়োচিত সৌজন্য দেখিয়ে বললাম, আপনি শীঘ্রই নিরাময় হয়ে উঠুন এই কামনা করি। আসবো আবার বর্ষা-মঙ্গলের সময়। হাসলেন। বললেন, 'তোমাদের বোধহয় বিশ্বাস, চিত্রগুপ্তের অফিস থেকে আমার হিসাবের খাতা হারিয়ে গেছে!' ঘরে অনেকেই ছিলেন, দেখলাম এ কথার পর সকলেরই চোখ ছল ছল করছে। বেরিয়ে এলাম।

এর ক-দিন পরেই কবি এলেন কলকাতায়— অস্ত্রোপচার অনিবার্য্য হয়েছে। দু-দিন মাত্র গেছি সে সময়ে—যেদিন তাঁর দেহে অপারেশন করা হল সেদিন, (কথাবার্ত্তা হয়নি কিছুই, শুধু দূর থেকে দেখে চলে এসেছি) —আর যেদিন তাঁর জীবনান্ত হল সেদিন! কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ সেদিন থেকেই দূরের মানুষ—আর সেখান থেকেই আমার কাহিনীর শেষ। শুধু আর দু-একটা কথা বাকী রয়েছে, যা বলবো পরের অধ্যায়ে।

—১৫—

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমার কাহিনী শেষ হল। কিছুকাল কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলাম—নানা অবস্থার পটভূমিতে তাঁর প্রাত্যহিক জীবন ও তার রকমারি খুঁটিনাটি লক্ষ্য করেছি, নানা জনের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে নানা বিষয়ে তাঁর মতামত শুনেছি, নিজেও ইচ্ছা করে অনেক আলোচনা খুঁচিয়ে তুলেছি—সেই সব অভিজ্ঞতা ও শ্রুতির সঞ্চয়ই পরিবেষণ করেছি আমার এই কাহিনীতে।

এই কাহিনী যখনকার, তখন রবীন্দ্রনাথ চুয়াত্তরের কোঠা পার করেছেন, দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছেন আশীর সীমানার দিকে। যদিও তিনি কর্ম্মশক্তি, উদ্যম ও মননশীলতায় তখনো যুবক বললেই চলে, তবু স্বভাব-ধর্ম্মেই কতকগুলো শক্তি তাঁর অপচিত হয়েছে—দেখেন ও শোনেন কম, গতিও কতকটা শ্লথ হয়েছে—বহিরঙ্গিক কর্ম্মক্ষেত্র থেকে যথাসম্ভব নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন—কোন কোন বিষয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন—অর্থাৎ সে তাঁর জীবন-সায়াহ্ন। সেই সায়াহ্নের নানা খণ্ড-প্রসঙ্গ একত্র করে অস্তগামী রবির একটি অখণ্ড আলেখ্য খাড়া করতে চেষ্টা করেছি আমি। এ-ধরণের

স্মৃতিকথা কখনো সম্পূর্ণ হতে পাবে না। আমিও সে দাবী কববো না—ববীন্দ্র-জীবনেব একটা অধ্যায যদি কতকটাও উদ্‌ঘাটিত হযে থাকে আমাব বচনায়, তাহলেই আমি যথেষ্ট মনে করবো। যাঁবা দীর্ঘতর কাল ববীন্দ্র-সংসর্গ ছিলেন, মানুষ ববীন্দ্রনাথেব একটা পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি অঙ্কিত কবাব যোগ্যতা তাঁদেবই এবং তা কবাব সময়ও এখনি, কাবণ সেই সমস্ত ভদ্রলোকও অনেকেই জীবন-সীমান্তে উপনীত।

মহৎ ব্যক্তিব ভাব ও কর্ম্ম-জীবনটাই অবাবিত থাকে সাধাবণেব সাম্নে—সেই নির্ব্বিশেষ পবিচিতিব আড়ালে সুখে-দুঃখে যে বাস্তব মানুষটি বিদ্যমান, তাঁকে জানাব বা চেনাব সুযোগ অনেকেবই হয না, তাই তাঁব সম্বন্ধে মানুষেব কৌতূহলেবও অন্ত থাকে না। মহৎ জীবনেব ছোট একটা ঘটনা, ক্ষুদ্র একটা কথাও তাই মহামূল্য বলে গণ্য হয়। সেই কৌতূহলেব তাগিদ মেটাতেই এই কাহিনীব অবতাবণা। সুখেব বিষয, আবো অনেকে এ-কাজে অগ্রণী হয়েছেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে এই প্রসঙ্গে হুঁসিযাব থাকা দরকাব—অনেক সময় বড লোকের কথা বলতে বসে লেখক-লেখিকাবা আপন কাহিনীই দবাজ হাতে বিতবণ

করতে থাকেন। এতে তাঁদেরও গৌরব বাড়ে না, মহৎ চরিত্রেরও সম্মান রক্ষা হয় না—বলতে বাধা নেই, রবীন্দ্র-স্মৃতি-কথাতেও এ জিনিষ হচ্ছে। বলাই বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথের মতো অদ্বিতীয় পুরুষের সংস্রবে এসেছেন যিনি, যিনি তাঁর অনুগ্রহ পেয়েছেন, তিনি মহা ভাগ্যবান —সেই সৌভাগ্যের উল্লাসে কতকটা আত্মবিস্মৃতি আসা তাঁর হয়ত স্বাভাবিক, কিন্তু একটা জায়গায় এসে হাত-টানার প্রয়োজন আছেই। কবির মুখে নিজের কথা প্রক্ষেপ করা বা তাঁর সম্পর্কীয় আলোচনায় নিজের বৈষয়িক সুবিধার অনুকূল প্রসঙ্গগুলির অবতারণা না করাই আমি সমীচীন মনে করি। সেই জন্যেই আমি যথাসাধ্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবে এক-একটি প্রসঙ্গ ধরে কবিকে আঁকতে চেয়েছি এবং তাঁর নিজের কথাতেই তাঁকে বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছি। কিছু নোট রেখেছিলাম, সেটাই কাজে লেগে গেল। বেশী দূর এগুতে গেলে সত্যভ্রষ্ট হতে হবে—সুতরাং এখানেই ইতি।

আর একটা কথা এখানে বলতে হবে। কাছে থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে রকমটি দেখেছি, সেই তাঁর শেষ পরিচয় নয়। সমস্ত মানুষই এক সঙ্গে দ্বৈত-সত্তাসম্পন্ন—বিশেষ করে ভাবুক মানুষেরা ত বটেই এবং তাঁদের

বাইরের চেয়ে ভেতরের সত্তাটাই বড়। রবীন্দ্রনাথের এই ভেতরকার সত্তা—তাঁর আন্তর সত্তা—বোঝানোর কোন চেষ্টাই আমি করিনি। সেটা আলোচনার বস্তু নয়, অনুধাবনের বিষয়—যদিও তার অভিব্যক্তি পদে-পদেই লক্ষ্য করা যেতো তাঁর জীবনে! তাঁর চলন-বলন, আচার-ব্যবহার, কথা-বার্ত্তা সর্ব্বত্রই ফুটে উঠতো একটা অলঙ্কৃত ঐশ্বর্য্যের আভিজাত্য—যা হঠাৎ দেখলে কৃত্রিম মনে হবার সম্ভাবনা ছিল। প্রায় সমস্ত ব্যক্তিক ব্যাপারেই দেখা যেতো, ব্যক্তি-সীমা থেকে তিনি অনায়াসেই একটা নৈর্ব্যক্তিকতার স্তরে গিয়ে উঠেছেন—এ-ও প্রখর বাস্তব দৃষ্টির বিচারে অকৃত্রিম মনে হবার কারণ ছিল না। কিন্তু এ-ই ছিল তার মনোধর্ম্ম, এটা ভুল করলে তাঁর চরিত্রের সার্ব্বাঙ্গিক আবেদনকেই ভুল করা হবে।

বাস্তব জীবনে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ বড় কম পাননি—অল্প বয়সে তাঁর পত্নী বিয়োগ হয়েছে, একে একে অনেকগুলি পুত্র-কন্যা গেছে—ব্যবসা-বাণিজ্যে এক সময় প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করেছেন তিনি—শান্তিনিকেতন স্থাপনের প্রাথমিক পর্ব্বে অপরিসীম অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে—দেশের লোকের অবাঞ্ছিত প্রতিকূলতার স্রোতও কম ভাঙতে হয়নি—তারপর

পবিণত বার্দ্ধক্যে এক এক করে জীবনেব সহযোগী বন্ধুবা, সেবকেবা, স্নেহভাজন আত্মীযেবা বিদায নিয়েছেন—নিঃসঙ্গ বার্দ্ধক্যে দেখেছি তাঁকে, আপন কাজ-কর্ম্ম নিযে শান্তি-নিকেতনেব একান্তে দিবাবাত্রি আত্ম-নিমগ্ন থাকতে। সাধাবণ মানুষ হলে বলা যেতো, এ জীবন চবম বিক্ততার, অপাব শূন্যতাব—কিন্তু ববীন্দ্রনাথকে যাঁবা কখনো দেখেছেন, তাঁবাই জানেন যে এত সত্ত্বেও শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁব প্রাণটি ছিল আনন্দে, স্বস্তিতে, অপার্থিব সৌন্দর্য্য-বোধে কাণায কাণায় পূর্ণ। এই পূর্ণতাব মূলে ছিল তাঁব অন্তর্গূঢ় কবি-সত্তা, আপন প্রাণৈশ্বর্য্যেই যা উৎসাবিত হযেছে নিত্যনূতন রূপে-বঙে। এব প্রভাবেই বাস্তবের ভেতব থেকেও তিনি হতে পেবেছিলেন বাস্তবাতীত—যা সমালোচনাব ভাষায় হয়ত কৃত্রিমতা আখ্যা পেয়েছে।

আসলে সংসাব-জীবন বলতে আব পাঁচজনের ক্ষেত্রে যে-জীবন বোঝায়, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যে সে-জীবন বোঝাতো না, এই হল সত্যিকথা। তিনি সংসাবেব মধ্যে থেকেও নিজের সত্তাকে সংসার-তরঙ্গেব ওপরকাব স্তরে ভাসিযে বাখতে পেবেছিলেন—তাব ভেতর একেবাবে তলিয়ে যাননি। তাই এই জীবনেব ভাঙা-গড়া, ক্ষয-ক্ষতি সবই তাঁর অস্তিত্বেব ওপব পর্দ্দা দিযে ভেসে গেছে—ভেতবে

ছিল তাঁর যে আত্মসমাহিত কবিসত্তা, তাতে বড় রকমের ঘা কোন দিন দিতে পারেনি। এটা কি বৈরাগ্য ? মনে হয় বটে তাই, কিন্তু আসলে এ বৈরাগ্য নয়। বস্তু-জগৎ ও তার বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ও সজাগতা দেখেছি বরাবরই—জীবনকে উপভোগ করা বিষয়েও তাঁর কার্পণ্য দেখিনি কোন দিনই। বৈরাগীর দৃষ্টিভঙ্গী এ নয়, তাঁর কাছে বস্তু-জগৎ অসৎ—তিনি ইহলোকে আছেন, এই পর্য্যন্ত, কিন্তু অন্যতর লোকেই তাঁর মননশীলতা আবদ্ধ।

আসলে আমার মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ বস্তু-সংসার সম্বন্ধে ছিলেন একজন নিরপেক্ষ দ্রষ্টা ও উপভোক্তার মতো —এর সঙ্গে আপাদমস্তক নিজেকে জড়িয়ে গড়িয়ে একাকার হতে দেননি তিনি। তাই এর ভালো-মন্দ, দ্বিধা-দ্বন্দ, উত্থান-পতন সব কিছুই তাঁর সৃজনী-মনে গিয়ে অপূর্ব্ব একটা ঐক্যতানের মতো বেজেছে। প্রাত্যহিকতার সীমানা ছাড়িয়ে সব কিছুই তাই হতে পেরেছে নৈর্ব্যক্তিক একটা অনুভূতির মতো। বলা যেতে পারে, এটা তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা—হয়ত তাই। কিন্তু স্রষ্টা যিনি, তাঁর পক্ষে ত এটা নিন্দার কথা কিছু নয়!

আগেই বলেছি, দুঃখ-কষ্টে আনন্দ-বিষাদে তিনি আমাদের মতোই বিচলিত হতেন। আমাদের মতোই

অন্যের আপদ-বিপদে উদ্বিগ্ন হতেন। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি, মন তাঁর বেশীক্ষণ দাঁড়াতো না সে-সবের ওপর—মুহূর্ত্তেই তা ভেসে চলে যেতো দূর দূরান্তে।

একটা ঘটনা বলছি—এ আমি ভুলতে পারবো না কোন দিনই। এক ভদ্রলোক সদ্য পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে এসেছেন কবির কাছে—বিহ্বল হয়েছেন কবিও—কারণ বালকটি ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়। কিন্তু সমবেদনা প্রকাশ করলেন তিনি যে ভাষায়, তা আমরা করি না। ভাষাগত কারিকুরি ও অলঙ্করণের কথা বলছি না, তাঁর মূল বক্তব্যের কথাই বলছি। তিনি বললেন, 'মৃত্যুর মধ্যে একটা রূপ আছে—সেটা বোঝা যায় না যখন সে ঝড়ের মতো এসে সব ভেঙে-চুরে একাকার করে দিয়ে যায়। যখন সুরু হয় নূতন সৃষ্টির পালা, দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত নূতন বীজ যখন আবার পত্রে-পুষ্পে রোমাঞ্চিত হয়ে দেখা দেয়, তখনি প্রকাশ পায় সে রূপটা।' এর পরই বললেন, মৃত্যু তাঁর নিজের জীবনকে কত সঞ্চয় দিয়ে গেছে—তাঁর পত্নীর মৃত্যু, পুত্র-কন্যার মৃত্যু, আরো কত মৃত্যু।

বাস্তব মৃত্যু-শোক থেকে তাঁর চিত্ত এত বেশী ঊর্দ্ধায়িত ছিল যে এর প্রাত্যহিক দিকটা, বস্তুগত দিকটা তাঁর কাছে ছিল যেন একটা বিশ্ব-লীলার মতো। সেই

লীলার পরিপূরকরূপেই যেন তিনি দেখতেন সমস্ত জাগতিক ব্যাপারকে। অদ্ভুত মনে হয়, কিন্তু এই ছিল তাঁর ভেতবকার স্বরূপ। পত্নীর মৃত্যু সম্পর্কে একদিন যা বলেছিলেন, সেই একটা মাত্র কথাকেই আমি এই প্রসঙ্গে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত কবছি। তিনি বলেছিলেন, 'আমার জন্যে সব চেয়ে বড় ত্যাগ, সব চেয়ে বড় দুঃখকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। আমাকে সার্থক করাব জন্যে তাঁর এই যে আত্মদান, এব সম্পূর্ণ মূল্য কি আমি দিতে পেরেছি ?'

তাঁর গল্প-উপন্যাসে বা নাটকে বস্তু-সংসার প্রতিফলিত হয়নি পূর্ণরূপে—লিরিক কবিতাতেও ব্যক্তিক অনুভূতিব সুর বেজেছে কম—এব কাবণ খুঁজতে হলে, যেতে হয় তাঁর জীবনে। সেখানে গেলেই সহজ হয়ে যায় সমস্ত সমস্যা। দেখা যায়, অভ্যস্ত সমাজ-জীবনের সঙ্গে বাইরে তাঁর প্রগাঢ় মিল থাকলেও, ভেতবে ছিল দুবতিক্রম্য দূরত্ব। সেই দূরত্বটাই প্রকাশ পেতো তাঁর সব কাজে, সব কথায়, সমস্ত চিন্তায়-চেষ্টায়। অবশ্য চক্ষুষ্মানের কাছে।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চরিত্রের এই আত্মস্বতন্ত্র অন্তর্মুখিতা সত্ত্বেও বাইরের জগৎকে মানিয়ে পুষিয়ে নিতে পেবেছিলেন, যা পারেন না অনেক

বড় মানুষই। তুলনা করতে পারি বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে। বাইরের সংসারে খাপ খাওয়াতে না পারাব অদ্ভুত দক্ষতা দেখা যায় শ'র। যেখানে মূঢ়তা, দীনতা, দৌর্ব্বল্য, কাপট্য, সেখানেই তিনি উগ্র, সেখানেই তিনি অকরুণ—সর্ব্বদাই যেন রয়েছেন হাতে চাবুক নিযে এবং নাক-মুখ সিঁটকে। ববীন্দ্রনাথ সমস্ত ক্ষুদ্রতা, খর্ব্বতা, দৈন্য ও দৌর্ব্বল্যকে সত্য এবং সহজ জেনেই তার সঙ্গে আপোষ রফা করতে পেবেছিলেন। শুধু ঘরে নয়, ঘরে-পরে সর্ব্বত্রই তাঁর এই সহজনমনীয়তা পবিস্ফুট হত। তাই যে-কেউ তাঁর সংস্রবে এসেছে, সে-ই অভিভূত হয়েছে তাঁর স্নেহশীল আন্তরিকতায়। এমন একটা বড় সংস্কৃতির জোর ছিল তাঁর, যাতে আপন বস্তু-সত্তা ও ভাব-সত্তার ভেতর তিনি অল্লায়াসেই একটি সামঞ্জস্য আনতে পেরেছিলেন। তাই যাঁরা তাঁকে কাছে পেয়েছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ করে পাননি বলে ক্ষোভ করতে পারেন না। সৌজন্যে, আমোদে-কৌতুকে, আলাপে-উল্লাসে তিনি তাঁদের অভিভূত করে দিয়েছিলেন। সেই জন্যেই তিনি আসলে দূরেব মানুষ হয়েও ছিলেন সকলেরই কাছের মানুষ। অনাগত দিনের ভাগ্যে দেখা হবে না সেই কাছের মানুষকে—তাঁদের চেয়ে আমরা ভাগ্যবান বৈকি!

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এ সবই হল তাঁর সত্তার সদর-মহলের অভিব্যক্তি। তাঁর অন্দরটা ছিল এ থেকে অনেক দূরে। সেখানে তিনি একক, আত্মস্বতন্ত্র, অদোসর। তবে সৌভাগ্য এই যে ভেতরটা তাঁব মরুভূমি বিশেব ছিল না—ৰূপে-বসে তা ছিল চিরসজীব, চিরস্থন্দর—তারি রং এসে পড়তো বাইবের ওপর, তাই বাইরেটা তার আপাত-কুশ্রীতা নিয়েও মনোরম হয়ে উঠতো তাঁর চোখে। মনের এই ছুটো রঙীন চোখ ছিল বলেই তিনি বস্তু-সংসারকে অত চমৎকাব কবে মানিয়ে নিতে পেবেছিলেন, নইলে হয়ত তাঁর অভিব্যক্তিও হত বার্ণার্ড শ'র মতোই নিষ্করুণ।

তাঁর অন্তবের এই স্বাভাবিক সজীবতা শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনেই দেখেছি। শ্যামলীব পেছন দিকেব বারান্দা থেকে লম্বালম্বি গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত চলে গেছে যে উঁচু-নীচু মাঠ, তার দিকে চোখ রেখে একদিন ছুপুরে বসে আছেন কবি। দারুণ গ্রীষ্মের ছুপুর—রৌদ্রের হল্কা আসছে হু-হু করে—জানলা বন্ধ করেন নি—হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দেখেছো, আকাশ আর মাটি এক হয়ে যেন জ্বলছে! ছবিতে আঁকতে চেষ্টা করছি জিনিষটা।' তাকিয়ে দেখি, হাতের কাছে একটা কাগজ এবং তার

ওপর রং-বেরঙের কালির পোঁচ। ছবি আঁকছিলেন। আপন মনেই বলে চললেন, 'পৃথিবীর রূপ কোন দিন আমার চোখে পুরানো হল না। কিন্তু চোখ ক্রমেই অকর্ম্মণ্য হয়ে আসছে—হয়ত আর বেশী দিন দেখতে পাবো না।' একটু থেকে থেমে আবার বললেন, 'মনের দরজা আমার কোন দিনই বন্ধ হবে না। খানে জরা-মৃত্যু-ব্যাধি কোন কিছুরই প্রবেশাধিকার নেই—চিরদিনই সে দেবে সুন্দরকে তার পূজার অর্ঘ্য।' শুনলাম। বুঝলাম, এই তাঁর আসল পরিচয়, সাংসারিক পরিচয় তাঁর নির্ম্মোক মাত্র।